নয়া পত্তন

প্রথম খণ্ড
শিয়ালদা পর্ব

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপ্রীতেন রায়

শ্রীসঞ্জীবনপ্রসাদ

বন্ধুদ্বয়কে—

NAYA PATTAN 1st Part
SEALDAH PARBA

এই লেখকের অন্যান্য বই

সতের নম্বর বাড়ী (অনুবাদ)

শেষ অভিসারে

নয়া পত্তন (২য় খণ্ড আন্দামান পর্ব) যন্ত্রস্থ

উত্তর বন্যা

বেপরোয়া দৃঢ়তায় সারদা বলল ঃ একা মাতারী জিযুত পোলা নে এহানে রতি পারুম না কলাম। হে ছাওয়াল অষ্টপোর কনে থাহে কি করে জানে কেডা—এ্যাহন মর বিটি তুই মর !

থাক ! খুব অইচে আব গাজীর কেচ্চা গাওনের কাম নাই ! মাতারী থাকবি মাতাবীর লাখান ! দীনবন্ধুর মুখের রেখাগুলো অসহায-কঠোব হয়ে ওঠে।

আমাব কতা এ্যাহন গাজীর কেচ্চাই লাগব ত ! শোনায় কেডা—সাধচি ? তয় আমায়ই বা সাতকাহন শোনাও ক্যান ? সারদা মুখ ঘুরিয়ে নেয় সবেগে। কড়ায় লাউয়ের বাকল ভাজায় বার কয়েক দক্ষ ক্ষিপ্রতায খুন্তী চালিয়ে কড়াব কানায় ঝাড়ে খুন্তীটা। ঝন ঝন করে ওঠে লোহার ভাঙ্গা কডাটা। জল ঢেলে দেয় একটু। বিশ্রী প্রতিবাদ ওঠে তপ্ত কডা থেকে। গন্ধ বেরুচ্ছে। বিনা তেলে রান্না —তলা ধরে গিছল।

কানের পাশ থেকে আধপোড়া বিডিটা টেনে নিয়ে উনুনপাড়ে গিয়ে বসল দীনবন্ধু। একটুকবো কাঠ তুলে নিয়ে ধরাল বিডিটা। একটা সরব সুখটান দিয়ে ধোঁয়াটা আয়েশ করে ছাড়তে ছাড়তে বলল, তা পাববা ক্যান ! এ পর্য্যন্ত কোন কামডা পারলি ক'ত ! এ্যায় পারুম না অয় পারুম না—যা কই তাই পারুম না। কি পারবি ক—শুইন্যা কানডা জুরাই এট্টু !

সারদা কথা বলে না। দীনবন্ধু গজ গজ করে। এ্যানে বইয়া বইয়া খাওন আইব অর লাইগ্যা ! বাবুভদ্দরগো বিটি অইছে অয়—

বাপদাদারা আইয়া মাসোয়ারা দিব ! শিয়ালদা বলে কতা—দেইখ্যাই মাথা ঘুরায়—কেডা চেনে কারে ? কাম ঘরে বইয়া আইব—কামের লাইগ্যা ঘুরতি হয়—ঘরে বইয়া কাম আহে না ! এ্যানে তোর আছে কোন ইষ্টিকুটুম—অ্যাঁ—এ্যাহন্ চুপ্ ! যেন রা-ডা কাডতি শেহে নাই ! তোলবার মত কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ খুঁজে পায় না দীনবন্ধু। অস্বস্তি এতে বাড়ে আরও।

বিয়ে করাটাই তখন ভুল হয়ে গিছল। এমন জানলে বিয়েয় বসত কোন হালায় ! মরাইয়ে ছিল ধান আর বুকে তাখৎ—একমাল্লাই নায়ের কাঁচা পয়সা তখন ঘরে ঢুকতে সুরু করেছে সবে—আত্যিশো কাড়াবার লোকের অভাব হয় নি। মাগ-ছাওয়াল—চেনা হয়ে গেছে সবাইকেই ! যে যার নিজের নিয়ে ব্যস্ত। শুধু মুখ দিয়ে রক্ত তুলে করে মর ! এই দীনবন্ধুর লাখান মানুষ তখন আর পিথিমেয় খুঁজে পাবে না ওরা !

হ চিনলাম—হগগলারেই চেনা অইল এই এণ্ডিয়ার বাড়ীতে ! বিড় বিড় করে বকে দীনবন্ধু।

চিনেছে বই কী—এই পাঁচবচ্ছরে বেবাক পৃথিবীটাকেই চিনে ফেলেছে ! চিনতে আর বাকী রইল না কিছু। ঐ একরত্তি মেয়ে রমলা। একঘটি জল এগিয়ে দিতে বললেও চটাস্ করে বলে বসে, পারুম না। ওরা কেউ কিছু পারবে না—পারবে যত দীনবন্ধু। কী —না—জন্ম দিছিলে কেন—এই ভাবটা আর কী। দীনবন্ধু ভ [illegible]রও ভাগ্যের সঙ্গে কাজিয়া করতে যাচ্ছে না !

না—তা যাচ্ছে না। আর কারো ভাগ্যের সঙ্গে কাজিয়া করতে যাচ্ছে না সত্যি তবে একবার নিজের ভাগ্যের সঙ্গে রণে ন'মবার পাঁয়তাড়া করছিল দীনবন্ধু। শরীলডা গরম হতে না হতে সারদা দিল ঠাণ্ডা জল ঢেলে—মেজাজটা খিঁচড়ে দিল। চার নম্বরের রাখাল মণ্ডল—বেলঘোরেয় যায় রাজমিস্ত্রীর যোগাড দিতে। সাতসিকে রোজ, দুআনা জলখাবার। ইট বইতে হয় চুন সুরকী মাখা তাগাড়

নিয়ে ভারা বেয়ে উঠতে হয় দোতলা তেতলায়—তা হোক, জোয়ান মানুষ, খাটনীতে বাধছে কোথায়? সাতসিকে পয়সা—কম নয়। সাতটা পয়সার মুখ দেখা যায় না তিন ভাঁটির পথ হেঁটেও, আর সাতসিকে—তাও রোজ, নিত্য।

আর কানাই—ওর ছেলে কানাই—জোয়ান মদ্দ ছাওয়াল—সেই যে পিনু গোঁসাইএর কথা শুনে চর গুরশীদের বড় ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিছল দীনবন্ধু—তাই হল কাল! এন্‌ট্রেস্‌ ছেকেন কেলাশ অব্দি পড়ে—নাঃ হত পোলাডার। এন্‌ট্রেস্‌ পাশ ওর হত! কিন্তু হল কী এখন? না পারে রাজমিস্ত্রীর জোগাড় দিতে না পারে মোট বইতে। আরে খাবি কী বণটা!

খাবার ভাবনাই বড় ভাবনা। এ ত নিজের বুদ্ধির দোষ দীনবন্ধুর। এক একসময় শানের মেঝেয় কপাল আছড়ে মরতে ইচ্ছা হয় তার। এ সর্ব্বনাশ করল পীরগঞ্জের বাবুরাই! এখন আর চিনতে পারে না! বাড়ী গেলে একবাব বলে না, বয়! উপরন্তু—

তা হোক সে যা কপালে ছিল হয়ে গেছে। এখন কপাল চাপড়ে আব লাভ কী! একটা কাজকর্ম জোগাড করার কথাই কদিন ধরে ভাবছিল ও। হাতের পয়সা শেষই একরকম। সাড়ে তিনশো টাকা নিয়ে বডার পার হয়েছিল—উড়িষ্যায়ও খরচ খরচা বাদে হাতে ছিল কিছু। কিন্তু আর সাড়ে তিন সপ্ত ও চলবে না। তারপর? অন্ধকার। পৃথিবার সব আলো নিভে যায় ভাবতে গেলেই। শিয়ালদা ষ্টেশনের নিয়নবাতিগুলো কেবল শয়তানের চোখের মত দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে। অকল্যাণ্ড—অকল্যাণ্ডে গেলে কেউ কথা কয় না পয়সা না হলে!

কাজের সন্ধানেই দুচার দিনের জন্যে বেরুতে চেয়েছিল দীনবন্ধু। সারদা সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। দুচোখে ব্যাথা ঘনিয়ে এল তার। দীনবন্ধুকে এ পাগলামী থেকে—হ্যা, পাগলামী বই কী—নিরস্ত করবার জন্য জিভটায় খানিকটা শান দিয়েই বলল, হয়, তোমার

লাইগ্যা কাম নে লোকে বইয়া আছে ছ্যাহ না ! ভরা জোয়ান গো কুলি লয় না কেউ—তোমায় ত আগে নিব ! ছ্যাখচ না কানাইডারে—ব্যান থে সাঁঝ অব্দি ঘুরতেই আছে—বোলায় কেউ ? তু'গণ্ডা পয়সা আনতি ছ্যাখচ কোনদিন !

ছেলে কানাই। দীনবন্ধুকে ওর বয়েস জিগ্যেস করলে বলে, কবে কেডা। অয় হেই আশ্বিনের বড়ধাবাড়ে তু-চার পা হাঁটতি পারে। আমাগো আর সন তারিখ নিকে রাকচে কেডা !

সেই আশ্বিনের বড়ধাবাড়ে তু-এক পা হাঁটতে পারা কানাই হেঁটে হেঁটে পায়ের শির ছিঁড়ে ফেলল প্রায়। তুর্যোগের দিনে হাঁটতে শিখে তুর্যোগ ওর চলার সাথী হয়ে পড়েছে। কোন কোন দিন চলে যায় রাণাঘাট অবধি। কাজ—কাজ চায় একটা—যে কাজ যে কোন কাজ। কিন্তু ওর আগে আরো অনেক মানুষ হেঁটেছে ঐ পথে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের মত ওর হাঁটাই সার হয়। কাজ মেলে না।

কদিন ভিড়েছিল রামপালের অম্বিকের সঙ্গে। অম্বিকে সমদ্দার, সুপুরী ব্ল্যাক করে, বর্ডার স্লিপের দালালী করে। থানায়, রিলিফ অফিসে দহরম-মহরম খুব। সাহস দিয়েছিল সেই অম্বিকেই। যা কই তা শোন বাইডি—এই অম্বিকে সমদ্দার থাকতি ডরাবা না কাকেও। থানাই কও আর কাষ্টমই কও সব শালায় এর হাতের মদ্দি।

তা থাক—তবু সাহস হয়নি কানাইয়ের। ভরসায় কুলোয় নি।

বিদ্রূপ করেছিল অম্বিকে, ভগমান তরে বিটি করতি ভুল বইর‍্যা ব্যাটা বানাইছে এই কলাম কানাই ! যা যা মার কোলে শুইয়া তুধ খা গা !

বিদ্রূপেও কাজ হয় নি। কানাই রাজী হয় নি। রাজী হয় নি বটে পয়সা রোজগারের কোন বিকল্প পথও খুঁজে পায় নি। সকাল বেলা কাজের ধান্দায় বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যায় কোনদিন আরো

পরে। যাবার সময় চোখের কোনে আশার আলো চিক চিক করে ফিরে আসে কলকাতা সহরের সন্ধ্যামলিন গলির মত ধোঁয়ায় ভারী আর গুমোট মুখ নিয়ে।

সবই জানে দীনবন্ধু। তবু হাত পা কোলে করে বসে থাকতে ভয় লাগে। বুকের মধ্যে রাজ্যের ভয়-ত্রাস দলা পাকায়। এক এক সময় ভয়ে দমবন্ধ হয়ে যায় যেন। খালবিল আর নদীর মাঝে দ্বীপের মত ডাঙ্গা—জ্ঞান হয়ে অবধি দেখ্ছে লড়াই। লড়াই প্রকৃতির সঙ্গে, লড়াই পড়শীর সঙ্গে, লড়াই মালিকের সঙ্গে দেহটাতে প্রাণটাকে ধরে রাখবার লড়াই। দুবেলা দুমুটো ভাত আর পরণের একটুকরো কাপড়ের লড়াই। নিরবসর—নিরন্ধ্র!

চার চারটে বছর! চার চারটে বছর ধরে খোলা মাঠে লাঠি ঘুরিয়েছে—এখনো ঘুরুচ্ছে সে! শত্রু খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে একবার—হ্যাঁ পেলে ল্যাজার এককোপে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত! প্রতিপক্ষ খুঁজে না পেয়ে ভাগ্যকেই প্রতিপক্ষ খাড়া করেছে দীনবন্ধু। এ এমন প্রতিপক্ষ যার সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পন করার জন্যই যেন এ প্রতিপক্ষকে সৃষ্টি করে মানুষ! মৃত্যুর সঙ্গে এতদিন পাঞ্জা লড়ে এসে হঠাৎ যেন মুষড়ে পড়েছে তার হাতটাই! পিছন থেকে অতর্কিত আঘাতে কব্জি তার পঙ্গু হয়ে গেছে—শ্বাসবায়ু বিষিয়ে উঠছে।

যা ভালো বুজবা করবা—আম্মো আর মরার লাখান বইয়া রতি পারুম না। হয় করুম্ নয় মরুম্ দুয়ের এট্টা! থামল দীনবন্ধু। অনেকটা প্রাণশক্তি ব্যয় হল কথাকটা বলতে। অনেকখানি আবেগ ঢালতে হল কথায়। অবুঝ মেয়েমানুষ, বুঝোতে হবে ত তাকে! ব্যয়িত শক্তিটুকু সঞ্চয়ের জন্যই যেন থেমেছে দীনবন্ধু। সারদা চকিতদৃষ্টিতে একবার দীনবন্ধুর মুখটা দেখে নিল। কলাগাছের হাজা খোলার মতই বিবর্ণ, পাঁশুটে। পাছে আরো কিছু বলে ফেলে দীনবন্ধু এই ভয় সারদার। মরণের কতা কয় কি করে ব্যাটা গুলোন!

ওর কথা বলার আবেগ অবদমিত করার জন্যই ব্যঙ্গোক্তি করে সারদা, যে দিকি তুচোক যায় চইল্যা যামু! বয় ত্যাহাও কারে? চোক তুটো আর যাবে কনে—শেয়ালদার বাড়ী, চোক গেলি যাবে ঐ রেল লাইন নয় চাকা তব্দি—তা ওহানেই যাবা নাঈ?

হঠাৎ থেমে যায় সারদা। মনে হয় একী বলছে সে। সামলাতে চায়—ভিজে গলায় বলে, হ বাকী আব থুইলা কা ওড়াই বা থাহে ক্যান। মনে যহন ঠিক দিছ সাইব্যাই ফ্যাল ওড়াও। আফশোষ আর থাহে ক্যান। কাঁদতে সুরু করে সাবদা। সামলাতে গিয়ে একী বলল সে। এ ত বলতে চায় নি সারদা। ফ্যাচ্ করে আঁচলে নাকটা ঝেড়ে নিয়ে আবার ফোঁপায়। কী বলবে ভেবে পায় না। আর কিছু বলতে সাহসও হয় না। স্বামীব সাথে কথা বলতে ভাষার দৈন্য তাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে নি কোনদিন। যেমন ভাবা যায় তেমনটি বলা যে এত শক্ত, বোঝে নি এর আগে।

সারদার কথার ধরনে মেজাজটা খুবই খিঁচড়ে গেল দীনবন্ধুব কিন্তু সেই সঙ্গে ওব ফুলে ফুলে কান্না দেখে সে ভাবটা সেঁতিয়ে যায়।

হয—সুরু করলা ত! থাকনের মধ্যি ঐ চোক্যের জল—লডতি চড়তি ত্যাখাবা বই কা। কান্দো মন খুইল্যা কান্দো—ত্যাবে এই দীনবন্ধু দাসকে আর ঐ চোক্যের জলে টলাতি পারবা না কলাম।

পালাবার পথ খোঁজে দীনবন্ধু। সারদা কাঁদলে সে দেখতে পারে না। মনে হয় ওর চোখের জল বেরুচ্ছে দীনবন্ধুরই বুকটা খালি করে। আর যাই হোক সারদা ছিঁচকাঁদুনে ছিল না কোনদিনই—কাঁদবার সময়ই বা ছিল কখন? আজকাল এককথায় চোখে অত জল আসে কোথা থেকে? ভাবে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু যেন পালিয়ে বাঁচে। যাবার সময় অনেক চেষ্টা সত্বেও ওর কান্নামুখটা একবার না দেখে পারলে না। ঘরবাড়ী যখন ছিল মিষ্টি কথায় আদর করে ভোলাত—ত্রুটি না

থাকলেও ঘাট স্বীকার করত—এ শিয়ালদা ষ্টেশন। ভাবা যায় না সে সব কথা। ভাবতেই লজ্জা লাগে এই বুড়ো বয়েসেও। মনে হয় আশেপাশের সব মানুষগুলো বুঝি ওর মনের মধ্যেকার কথাটাকেই দেখতে পেয়ে ভীড় করে আসছে ওর দিকে রঙ্গ দেখতে।

সারদা ঝাপসা চোখেই কড়ায় খুন্তী চালাতে লাগল আর নিজের অন্তিম বিকার ঘনিয়েছে একথা বার বার নিজেকেই জানাতে লাগল। বরাত—সবই বরাত! বরাতগুণে সবই হয়—দীনবন্ধুর মত ভিজে-মাটির মানুষ সে-ও আজকাল—নাঃ বেঁচে আর লাভ নেই! কপালে সুখ যদ্দিন লেকা ছিল হয়ে গেছে এখন মরতে পারলে বোঝে! আরও দেখতে হবে নয়ত অনেক! হাসি ঠাট্টা ছাড়া যার কথা ছিল না সেই মানুষ আজ এককথায় অনায়াসে সাতকথা শুনিয়ে দেয়। নেহাৎ ইষ্টিশন তাই, না হলে যে রকম তেড়েমেড়ে ওঠে, বুড়ো বয়েসে ঠ্যাঙানিই খেতে হত হয়ত! মুখে কিছুই আটকায় না আজকাল! সারাদিন খাটত খুটত সন্ধ্যায় এসে হাতনেয় বসে পায় গরম তেল ডলত। কোনদিন তামাক না ধরলে হয়ত বলে বসত, অ বৌ, তোর রূপের আগুনে আস্ত মনিষ্যিটা রাত্তরদিন জ্বলতেই আছি আর তোর আখার আগুনে তামুক জ্বলে না এ্যা কোন বিত্তান্ত রে!

কানাই হয়ত হাতনের একধারে বসে পড়ছে তখন। মনটা খুশী হলেও সারদার লজ্জা হত বই কী। চাপা গলায় ধমক দিত দীনবন্ধুকে। ইসারায় ইঙ্গিত করত, ছেলে বড় হয়েছে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

আচ্ছা মানুষ যাহোক!

হয়ত একগাল হেসে বলে বসত। হক কতা বাপের সাম্নেও কতি পারি—অয় ত ছাওয়াল!

তখন রান্নাঘরে ঢুকে পড়া ছাড়া আর গতি থাকত কী সারদার!

দীনবন্ধু ত তখনো খিক্ খিক্ করে হাসছে। কী সোন্দর সে হাসি!

হাসত—রাতদিনই হাসত দীনবন্ধু। কথায় হাসির বাণ ছুটত তার। আর সেই মানুষই আজকাল যেন রোদশুকনো নাড়ার মত রুখে আছে—সামান্য বাতাসেই খ্যার্ খ্যার্ করে বেজে ওঠে।

সারদা আড়চোখে একবার দীনবন্ধুকে দেখল—চলল কোথায়! কে জানে মন প্রাণের যা অবস্থা তাতে আর ভরসা নেই একটুও। কখন কী করতে কী করে বসে তার ঠিক কী?

দীনবন্ধু গিয়ে বসল বেজেন মালোর সীটে। প্লাটফরমেই ছেঁড়া ময়লা কাঁথা মাদুর বিছিয়ে ওদের প্রত্যেকের দিবারাত্রের সীট!

সারদা নিশ্চিন্ত হয় কতকটা।

বেজেন মালোর বউ ছেলেকে মাই দিচ্ছিল। দীনবন্ধু যেতে ঘোমটাটা অল্প টেনে দিয়ে একটু আড়াল করে বসল। আড়াল করল ওদের দিকেই—ইষ্টিশনে গিজ গিজ করছে লোক। ক'জনকে আড়াল করবে। ইষ্টিশনের আর-মানুষগুলোকে ইট-কাঠ-পাথরের মতই মনে করতে হয়। লোক গিস্ গিস্ করছে সবসময়—চারিদিক থেকে কর্মব্যস্ত মানুষের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে শিয়ালদা ষ্টেশনে—সবাইকে লজ্জা করতে গেলে বাচ্চা বাঁচবে কেন! লজ্জারও স্থান-কাল-পাত্রভেদ আছে। ডুবন্ত মানুষের কী আর পরণের কাপড় সামলাবার কথা মনে থাকে? লজ্জা ঘেন্না সব বর্ডারের ওপারেই রেখে এসেছে। উড়িষ্যায় বসে আবার যেটুকু গজিয়েছিল সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়েছে শিয়ালদায় পৌঁছেই!

দীনবন্ধুর সঙ্গে বেজেন মালোও উড়িষ্যায় পুনর্বাসন পেয়েছিল। ওরা বলে নিব্বাসন! জমিতে বালি ওঠে, খাল বিল সব ভরে যায় বালিতে। নতুন বর্ষায় পাহাড়ী ঢল—তা থেকে বাঁচলে চাষ আবাদ —কেবল ধান, তাও সারারাত প্রাণ হাতে করে আগুন জ্বালিয়ে ক্ষেতে বসে মশা তাড়াও! মশা গায়ে বসত। তাদের তাড়ানর চেয়ে বড় গরজ হাতী বুনোশূয়োর তাড়ানো। ছোট বড় হাতীর পাল নামে জমিতে—প্রাণ হাতে করে আগুনের মশাল নিয়ে তাদের

তাড়িয়ে দিয়ে আসতে হয় পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত। পায়ের দিকে নজর দেওয়া যায় না তখন—যে কোন সময়ে পায়েয় তলায় পড়তে পারে বিষাক্ত সাপ। যার কামড়ে ওঝায় কুলোয় না। হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটলে পথ এগিয়ে থাকে খানিকটা! দিনে ময়ূরের ঝাঁক—হাজার হাজার ময়ূর। কেউ তিন বছর থেকেছে—কেউ দু বছর। অনেককেই পালাতে হয়েছে রাতের অন্ধকারে, পাওনাদারের ভয়ে। তারা ছাড়বে কেন? আটকাতেও পারে নি।

দ্বিতীয় কেউ বা তৃতীয় বারের উদ্বাস্তু এরা। আরো বেশীবারের সন্ধান যে পাওয়া যাবে না তা নয়। আছে। আর আছে দালাল—হরেক রকমের দালাল। জাল বর্ডার স্লিপ থেকে সুরু করে মেয়ে পর্য্যন্ত—বাদ নেই কিছুই।

চার নম্বরের একপাশে দোকান খুলে বসেছে মনোরঞ্জন হাওলাদার—নূন তেল গুড়্ক তামাক, আরো কী সব টুকিটাকা জিনিষ পত্র। খদ্দের এরাই।

রান্না খাওয়া শোয়া বসা সবই ওখানে। চারিদিকে নোংরা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ, আস্তাকুড়ের গন্ধ সব সময়—বেশ সহে গেছে। উপায় নেই। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য মনুষ্যত্বের। মনুষ্যত্ব নষ্ট এদের এততেও হয় নি। মানুষ বলেই এদের পুরান কথা মনে পড়ে—মনে পড়ে আর বুকের মধ্যে হু হু করে জ্বলতে থাকে। শিয়ালদা ষ্টেশনের নিয়নবাতি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মিলিয়ে যায় তাল গাছ সমান উঁচু গ্যালভানাইজ্ড্ করগেট শেড্। চোখের ওপর ভেসে ওঠে শনের বাড়ী একখানা—কাঁপতে থাকে চোখের ওপর। আগের চেয়ে পরিষ্কার আরো ঝকঝকে—নাচতে নাচতে দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যায় ক্রমশঃ। রেললাইন। ডি. এস বিল্ডিং আর চোখে পড়ে না—ধান আর নারকোল সুপুরীর বর্ণালীর ভিন্ন ভিন্ন রংমাখা শ্যামল স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য। তারপরই চোখ জ্বালা করে, পাতাদুটো ভারী হয়ে ওঠে।

এ আর কতটুকুই বা—ছেড়ে আসবার আগে মনে হয়েছিল। বাবুদের বাড়ীর কেউ কেউ যখন গিয়ে কলকাতার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দিত—গ্রামের ছোট খালটিকে নস্যাৎ করে দিত গঙ্গা রূপনারাণের বর্ণনায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন উপনিবেশের লোভনীয় চিত্রে—গাড়ী ঘোড়া কলকারখানা—আরো কত কী—তখন মনে হত এমন সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়। একখাবলা জমি—এ আর কতটুকু! মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষেযে তা যথেষ্ট নয় রায় বাড়ীর মেজকর্তা গনেশরায়ের কথায় বুঝতে পেরেছিল দীনবন্ধু। এতদিন ঐটুকুর ভরসাতেই যে কী করে বেঁচে ছিল ভাবতে আশ্চর্য্য লেগেছিল দীনবন্ধুর!

সে ঘোর এখন কেটে গেছে। উড়িষ্যার যখন ডাক হল গণেশ রায়ের কথামতই নাম দিয়ে দিল দীনবন্ধু। যে এতদিন নিজের বুদ্ধিতে চলে এসেছে একটা সংসার চালিয়ে এসেছে সে আর মেজকর্তার কথা ছাড়া একপা চলতে ভরসা পায় না! তারপর উড়িষ্যার শিক্ষা ওরা পেয়েছে যৌথভাবেই—ছেড়েছে ষাট পরিবার একরাতে। আরো আসছে অনেকে। আসবে সুবিধা পেলেই।

আর নয়—মেজবাবুর কথায় আর নয়। উড়িষ্যা থেকে ফিরে এসে একদিন গিছল মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। বরানগরে। হেঁটেই গিছল। ভাবতে গেলে এখনো লজ্জায় মাথা কাটা যায় দীনবন্ধুর—তাড়িয়ে দিল! দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল! যেন চোর সে—যেন মেজবাবুর বাড়ীই চুরি করে তার পায় ধরে ক্ষমা চাইতে গিছল দীনবন্ধু—এমন ভাবখানা!

এখন নিজেকে বড় বোকা মনে হয় দীনবন্ধুর। কই উড়িষ্যায় যাবার আগে একবারও ত মনে হয় নি মেজবাবু আর সে একই খালের জলখেয়ে মানুষ তিনি থাকছেন বরানগরে তেতলা বাড়ীতে আর ও কেন যাবে উড়িষ্যায়?

কেন যাবে? এই কেন-র উত্তর কিছুতেই পায় না দীনবন্ধু।

মেজকর্তাকে দেখলে ত মনে হয় না কোন ক্ষতি হয়েছে তার—

দেশছেড়ে কোন লোকসান হয়েছে বোঝা যায় না। কোথাকার যেন মেম্বার হয়েছে মেজকর্তা—পুরানো মটর গাড়ীও কিনেছে একখানা। একছেলে পড়ছে ডাক্তারী আরেক ছেলে ইনজিনিয়ারিং। ইনজিনিয়ারিং পড়ে কী রেলইঞ্জিন চালাতে শেখে? ঐ কালীঝুলি মাখা ইনজিন ড্রাইভারদের নিত্য দেখছে দীনবন্ধু—ফায়ার ম্যানদের লক্ষ্য করে করে দেখে—ইনজিনে কয়লা মারতে দেখে আর ভাবে ওরাও বুঝি মেজবাবুর বড় পোলার মত ইনজিনিয়ারিং শিখছে!

দীনবন্ধুর মাথায় ঢোকে না কিছু—বোঝে না ঐসব মালেক বাবুদের কাণ্ডকারখানা। ইনজিনে কয়লা মারা ও তো ওর কানাইও পারে—তবে কি যেন গোলমাল হয়ে যায় সব। ও শিখতে এলে-বিয়ে পাশ করার লাগে কী—বুঝে পায় না দীনবন্ধু! সে আবার নাকি বিলেতেও যাবে এখানকার পড়া শেষ হলে—বিলেতের ইনজিনের কাজ বুঝি আরও শক্ত? হবেও বা! জাহাজের ইনজিন—সাগরে চলে সে জাহাজ। সে নাকি এক একটা গাঁয়ের লাখান বড়—হাট বাজার সব আছে। তার একপ্রান্ত থেকে নাকি অপর প্রান্তে হেঁটে যায় না কেউ—পাকা রাস্তা আছে মটর গাড়ী চেপে যায়। ছেলেবেলায় শোনা—বড়োধুড়োরা বলত। পাশের পড়া পড়তে যাবে সেই জাহাজে—ইনজিনের পাশের পড়া।

পাশের পড়া ত কানাইও পড়ত—আর দুটো বছর। পুরো দুটো বছরও নয়। নাঃ—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিছল দীনবন্ধু। হবে কেন? হালুটি করে কাটাল বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষ আর ও গিছল কায়েত বামুনের নাগাল ধরতে—হবে কেন? শাস্তর যে মিথ্যে হয়ে যায় তাহলে! হেলো দাসের ছাওয়াল গেছে বি-ছি-ডি পড়ে ভদ্দরনোক হতি! পেরথম ছাওয়াল কত আশা—তখন কী আর হিস্যিদিস্যি গ্যান থাহে! মনস্তয় লাটের বাপ হয়ে বয়ে হগগলাই! তা নইলে আর এ দশা হবে ক্যান! কতায় আছে না সুকে রতি বুতে কিলায়—হেই বিত্তান্ত।

শন ছাওয়া বাড়ী একখানা—তিন কুঠরী। হালুটি বাগবাগিচা মিলিয়ে জমিও সাড়ে তিন কানি—ভাতের ভাবনা ত এরকমভাবে ভাবতে হয় নি কোনদিন। ক্ষেতে খামারে যে ভাবেই হোক জীবনধারণ হত ঠিক একভাবে। মানুষের মত বাঁচা—বন্যা অজন্মা রোগ ঘোগ ছিল বটে তবে কিনা সুখদুখ্যু দুই ভাই, একটা এলে বুঝতে হত অন্যজনও পিছুপিছু আসছেন। জীবন আর নদী, নদী আর জীবন পাশাপাশি চলেছে দুটোয়—হাত জড়াজড়ি করে। বন্যা তুফানের মাঝ থেকে নাও বাঁচিয়ে নিস্কৃতির তৃপ্তির মাঝে দুশ্চিন্তা আর শ্রমস্বেদ মুছে দাঁড় বেয়ে চলা। মালেক মহাজনের খাজনা, পাইকেরের দাদন কর্জ সবই রক্ষা পেত ঐ একখাবলা জমি আর একমাল্লাই নায়ে। কিছু জমি আর মাথা গোঁজবার জায়গা যদি ভগবান একবার মিলিয়ে ছায় ত সেদিন ফিরতে কতক্ষণ।

বেজেন মালো ঐ এক কথাই ভাবছিল—একটু আধটু এদিক ওদিক! হুঁকা টানছিল বসে বসে! তামাকের ধোঁয়ার মাঝেই উপায় খুজছিল যেন—উপায় খুঁজছিল এ গোলক ধাঁধা থেকে বেরুনো যায় কী করে।

দীনবন্ধুকে হুঁকোটা দিয়ে একটুকরো কাঠ এগিয়ে দিল বসতে। কাশতে কাশতে একরাশ ধোঁয়া ছাডছিল বেজেন। মানুষ বাঁচিয়ে একখাবলা গয়ার ফেলল প্লাটফরমে।

অইল কী দীনুদা—কা ঠিক করলা ?

হ ঠিক এট্টা করচি—এয়ানে, এই শিয়ালদার বাড়ীতে বইয়াই মরতি অইব! দ্রুতলয়ে তামাক টানে দীনবন্ধু।

বেজেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। বলবে—সময় হলেই বলবে। নিজে বললে খুলে ধরবে মনটাকে।

আমাগো ঘরে রাজী অয় না—হে এক রামায়ণ মহাভারত বুইলা না—আবার হুঁকায় মন দেয় দীনবন্ধু। যত সব [illegible] পানাই বুইলা

না ? এই শেয়ালদার বাড়ীতেও বুতির ভয় ! কয় একা রওনের সাহস হয় না । একা যে কোনখানডায় বুইলাম না ! কথা কটা বলেই ঘনঘন টান দিতে লাগল হুঁকায় ।

বেজেনের বউ কামিনী আধো ঘোমটার ফাঁক থেকে তীব্র কটাক্ষে দীনবন্ধু আর তার নিজের মানুষটির মুখচোখ ভাল করে দেখে নিয়ে আগের মতই নির্লিপ্তভাবে ছেলেকে খাওয়াতে লাগল । আঁচল দিয়ে বাচ্চাটার গলার খাঁজে খাঁজে উনিয়ে ওঠা ময়লা মুছছিল বটে কিন্তু কান ছিল ওদের আলোচনায় । আশপাশে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে, সন্দিগ্ধ তির্যক দৃষ্টি । ব্রহ্মাণ্ডটাই যেন ওর পাশে বসে ছুরী শানাচ্ছে ওর অবলম্বনের সব গ্রন্থি কটা কেটে দেবার জন্য । অন্যমনস্ক কামিনী কোলের ছেলেটাকে কখনোও বা আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরবার জন্য মৃদুচাপ দেয়— চাপ দেয় অবচেতন মনেই । কিন্তু নির্বিকার— বহিঃপ্রকাশ নির্বিকার।

বেজেন এতক্ষণ দীনবন্ধুর কথা কটা নিয়েই ভাবছিল । সরবেই চিন্তা করতে থাকে—না পারলে চলবে ক্যান ? প্যাট কী বিটিগো কতায় থির থাকব ? কাজ কামের খোঁজ করতি অইব না ? এয়্যানে বওয়াইয়া খাওন জোগাইব কোন কুটুম ? আমাগো উনি ও তো—

হয়—আমি ক্যান হগ্‌গলাই এ বার্তাই কইব । কানায়ের মা হাচা কতাই কইচে—যা করনের মন চায় এয়্যানে বইয়া করতি কনে বাধতিচে ? এয়্যানে আমাগো কোন ইষ্টি কুটুম আছে যে দেখব ? চিনি কারে—আমাগোই বা জানে কেডা ? একি ছাশের বাড়ী পাইলা না-ঈ ? আন্ধারমানে নাম দিলে—মানা করছিলাম তহন ?

দাদা, শুইনলা ত ? কারে কী কই কতি পার ? মাজে মাজে মনস্ত হয় হোক শেয়ালদার বাড়ী তুগ্‌গো চাপড় মাইরা অর দাঁত কহানা ফ্যালাইয়া থুই ! বিরক্তি আর নৈরাশ্যে বেজেনের মুখ বিকৃত হয় । দুশ্চিন্তার রেখা পড়ে কপালে । রাগে কপালের শির দপদপ

করে। নিরূপায় আক্রোশ ফেটে পড়ে তার চোখের দৃষ্টিতে। কে যেন বেঁধে মারছে, প্রতিরোধের উপায় নেই।

হুম্! দীনবন্ধু হাঁটুর ওপর হাত আর হাতে মাথা রেখে ভাবতে থাকে। সে চিন্তার খেই নেই, সঙ্গতি নেই পারম্পর্যের।

হয়! কবে আকাশ ভাইঙ্গা মাতায় পড়ে হেই তরাসে ঘরে বইয়া থাকলি হয়! গেরাস মুয়ে উঠবো মন্তরে অগো! খ্যাক্ করে ওঠে বেজেন। কামিনী রা-টি কাড়ে না। বলার কথা ওর বেশী নেই—যা ছিল বলবার তা অন্ততঃ হাজার একবার বলা হয়ে গেছে বেজেনকে। করবার যা করবে—এখন মিছামিছি কথা বাড়িয়ে মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে লাভ কী! ছেলেটাকে স্তনান্তরে ঘুরিয়ে দেয় সে। শুধু তার সারা দেহটা শিথিল হয়ে যায় অভিমানে।

এক ফাঁকে উঠে চলে যায় দীনবন্ধু। ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে ট্র্যামডিপো বাঁহাতে রেখে বেরিয়ে যায়। গাড়ী ঘোড়ার ভীড়—ভীড় নানা বর্ণের মানুষের। মুটের চিৎকার মোটরের হর্ণ আর ট্র্যামের ঘণ্টা—একাকার সব, উন্মত্ত গলদঘর্ম কলকাতার গভীর নিঃশ্বাস শোনা যায়। অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয় পথের উপরকার ভীড়টুকু পর্য্যন্ত যেতে। গাড়ী ঘোড়ার প্রবাহে মুহূর্তের ভাঁটা পড়ার প্রতীক্ষা করে সকলের সঙ্গে। ওরই মধ্যে অনেকে দুখানা ট্র্যামের মধ্যখান দিয়ে ট্যাক্সি ঠ্যালাগাড়ি বাঁচিয়ে ধাবমান বোঝাই লরীর সুমুখ দিয়েই রাস্তা পার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক আধপলকের জন্য দাঁড়িয়ে দক্ষনিপুণতায় গাড়ীর নিশ্চিন্ত ধাক্কা এড়িয়ে যায়। ওভাবে পার হবার কথা ভাবতেই পারে না দীনবন্ধু চুপ করে দাঁড়িয়ে ভীড় দেখে সে। পথ ভর্তি, ট্র্যাম ভর্তি, বাস ভর্তি, ঠেলাঠেলি ভীড়। তিল ধারণের জায়গা নেই। মাথা, কেবল মানুষের মাথা—মানুষের মাথার মোয়া যেন।

দমকা হাওয়ায় হালকা মেঘ ছিঁড়ে যাবার মত পথটা খানিকটা খালি হয়ে যেতেই পিছনের ভীড়ের চাপে সে রাস্তার প্রায় মাঝখানে

পৌঁছে যায়। মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে আতংকে—পূর্ণবেগে লরী ছুটে আসছে—মাত্র কয়েক হাত দূরে। সহজ প্রেরণায় সুমুখদিকে ছুট দেয়—থমকে যায়—বাঁপাশেই একখানা ঘোড়ার গাড়ী। কুৎসিত খিস্তি করে ওঠে গাড়োয়ান। অভ্যাস মত রাশও টেনে ধরে হয়ত। দীনবন্ধুর খেয়াল নেই কোনদিকে। চারিদিকে মানুষ হৈ-হৈ করে উঠেছে—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য দীনবন্ধু। সুমুখের ফুটপাথ লক্ষ্য ওর। কি করে যেন সেখানে পৌঁছে যায়। পৌছেই পিছনে পথের দিকে তাকায়। সে যে চাপা পড়ে নি ঠিকমত বিশ্বাসই করতে পারছে না তখনো। বুকের মধ্যে শুধু চালকলের মত ঝপ্ ঝপ্ শব্দ!

আরও অনেকে ধীরে সুস্থেই পার হয়ে এলো রাস্তাটা। কে একজন উপদেশ ছুড়ে দেয়, ঐভাবে পথ পার হয়—এখুনি ত শেষ পথে পৌঁছে যাচ্ছিলে।

পটাশ্ করে কেবল একটি আওয়াজ শুনতে পেত—বুঝতেই পারত না পরমাত্মা হাওয়া। পানভর্তি মুখে বিচিত্র মুখভঙ্গী করে হাসল ভদ্রলোক। রুগ্ন ঘোড়ার মুখভ্যাংচানীর মত হাসি।

কে একজন বলল বুদ্ধু বাঙ্গাল কোথাকার—দিলে দেশটাকে উচ্ছন্নয়!

চুপ! এখুনি হাড়মাসের আলাদা ওজন দেখে ছাড়বে—চেপে যা।

থাম তুই। অপিসে শালাদের ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে ছাড়ি! সব ব্যাটা হ্যাশে জমিদার আছিল—দালান আছিল, কোঠা আছিল, আরাই কাহন গুয়ো নেরেলের গাছ আছিল—হেনো আছিল ত্যানো আছিল—কোন ব্যাটাকে বলতে শুনলাম না যে তার কিছু ছিল না। ছিল ত ছিল—যা না সেখানে যা না বাপু! কে তোদের পায়ে ধরে সেধে এনেছে? এই সর সর সরে দাঁড়া—শালারা নিজেরা পথে বসেছে—সস্তা জিনিষের লোভ দেখিয়ে ছুনিয়া শুদ্ধুকে এবার পথে নামাবে।

দীনবন্ধুর চিবুকের চামড়া থর থর করে কাঁপে কেবল। শোনে

সব। নাঃ—অপমান বোধ হয় না তেমন। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে বুঝি!

তরকারীর বাজারে ঢোকে দীনবন্ধু। বাজার করতে! করুণার হাসি হাসে দীনবন্ধু—করুণা নিজেরই উপর। দোকানের বাতিল শাকপাতা হাজাপচা কলামূলো কুড়িয়ে নিয়ে আসাই বাজার করা। কদিন আগে একদিক পচা মাদ্রাজী আলু পেয়েছিল একটা। বাদসাদ দিয়ে জিরে জিরে করে কুচিয়ে ঢিমে আঁচে মুড়মুড়ে করে ভেজেছিল সারদা—(না ছাঁকা তেল কোথায়—এখন কী আর ক্ষেতে সরষে ফলছে!) তেলের ছিটে দিয়ে। ভালই লেগেছিল—মুখ বদলান যতই হোক। এটা ওটা কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে রাখে আর আপনমনেই গজ-গজ করে—নাঃ—শালাদের জ্বালায় কিছু আর পাবার উপায় নেই!

উপায় থাকবে কী করে? ভোর থেকে অন্তত বিশজন এসে প্রত্যেকটি স্তূপ হাঁটকে গেছে। মেছো বাজারটা একটু ভাল করে দেখতে হবে! সময় সময় বেশ তেল কাঁটা পাওয়া যায়। সেদিন পেয়েছিল একটা রুই মাছের ভুঁড়ি—বেছে বেছে অনেকখানি তেল বেরিয়েছিল তা থেকে। আর একদিন—ছুটো কইমাছ—পেটের দিকটা পচে গলে গেলেও মাছ ত! কাটা ইলিশের কলাশী পাওয়া যায় প্রায়ই। মাছ নরম হয়ে এলে দোকানদাররা কলাশী আর ভুঁড়ি আগে ফেলে দেয়। মাছের বাজারে ভীড় খুব। মাছও ভালই জমেছে। মেছো বাজারের উঁচু শান আর পথের মাঝের অপরিসর নালায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁজতে থাকে দীনবন্ধু। হাতে করে তোলেও মাঝে মাঝে—কোনবার কলার খোসা, কোনবার বা কাগজের ভিজে ঠোঙা। ওধারের উঁচু বেদীতে বড় বড় মাছ সাজিয়ে দীর্ঘ গোঁফ লালভাঁটার মত চোখে জেলেরা কোলের ওপর ভুঁড়ি আর তার নীচে খাঁড়ার মত বঁটি চেপে ধরে ঢোলের মত শব্দ করে খদ্দের ডেকে চলেছে। প্রচার—আপন পণ্যের প্রচার! চাতাল থেকে খানিকটা

রক্ত তুলে নিয়ে ফ্যাকাসে কলাশীতে থাবড়ে দিয়ে হাঁকল একজন—বিয়ে বাড়ীতে লিবেন পান খাওয়া এয়োস্তিরি মাছ দেখে লিন বাবু। লগনসা তাই এত ভীড় বাজারে।

কে একজন অনেকক্ষণ ধরে কাটা ইলিশ দর করছিল। চারটাকা সের। অনেক ঘুরেও সস্তার ভরষা না পেয়ে ব্যাজার মুখে জেলেকে বলল, দাও আধপোয়া। বিদ্রূপ হাসির ঝিলিক দিল জেলের চোখে। ঝাপটা গোঁফের বাঁ প্রান্তটা ফিঙ্গের ল্যাজের মত লাফিয়ে উঠল একবার। মাছটা ওজন করে ওর থলিতে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আট আনা। ওরে হাবুল বাবুর বাড়ী আজ যগ্যি রে!

ভদ্রলোকের কথা বাড়াবার মেজাজ নেই—বাড়িয়েও লাভ নেই. মার খেতে হবে। নির্বাক যান্ত্রিক ভঙ্গিতে দামটা ফেলে দিয়ে ভীড়ে মিশে গেল।

ওসব দিকে লক্ষ্য দিতে গেলে দীনবন্ধুর চলে না। মাছের বাজারে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজে ওর কাজ কী। ওর লক্ষ্য মাছের ভুঁড়ি নয়ত ল্যাজের ডানা—খুব বেশী হয়ত পচামাছের কলাশী। মেয়েটা একটু মাছের গন্ধ না হলে খেতেই বসে না। খাবেত আধপেটা ভাত, তুবে। তাও যদি অছেদ্দায় খায়ত বাঁচবে কদিন! একেইত হাড়সার হয়েছে।

উঃ! আর্তনাদ করে ওঠে দীনবন্ধু। ভীড়ের মধ্যে জুতোশুদ্ধ পা একখানা চেপে বসেছিল ওর পায়ের ওপর।

আহা লাগল নাকি? মাঝ বয়সী ভদ্রলোক একজন।

লেগেছিল খুবই। হয়ত রক্তও বেরিয়ে থাকবে একটু আধটু—দেখাত যাবে না। মাথা নেড়ে জানাল. লাগে নি। সত্যিইত কে আর ইচ্ছে করে পা মাড়িয়ে দেয়।

এই-এই শোনত।

কাঁধে হাত পড়তে পিছন ফেরে দীনবন্ধু।

কী—আমায় কইছেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ এই মাছের টুকরীটা ইষ্টিশনে নিয়ে চল্। কত নিবি ?

কান পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে দীনবন্ধুর। রাগে অপমানে। কি একটা বলতেও যায় কিন্তু সামলে নেয় তখনি। শুধু বলে কত দিবেন ?

কত চাস তাই বল।

বড় জোর আধমন—তাই নয় ? ভদ্রলোকের সঙ্গী যোগ করে।

বেশ বড় মাপের রুই মাছ দুটো। কুলী খুঁজছিল। উটকো কুলী। ঝাঁকা মুটেদের খাঁই মেটানো মা লক্ষীরও কম্ম নয়। যতই দেওয়া যাক্—সন্তুষ্টি নেই। মজুরী বেশী নেয়ই—তাছাড়াও ষ্টেশনে পৌঁছে পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে দরদাম নিয়ে বড় ছ্যাঁচড়ামী করে।

কীরে চুপ করে রইলি যে—বোবা নাকি ?

অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার গা-সহা হয়ে এসেছে প্রায়—তবু মাঝে মাঝে মরামনটা প্রতিবাদ করে উঠতে চায়, দেহের সব রক্তকণিকাগুলো মোচড় দিয়ে ওঠে একসঙ্গে—থামিয়ে দেয় পয়সা। পয়সার গন্ধ পাওয়া গেছে এতদিনে। টুকরীটা ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়েই যদি কিছু পাওয়া যায় মন্দ কী ?

যা দিবেন কয়ে দ্যান। অসহায়ভাবে ওদের দিকে তাকায় দীনবন্ধু। মজুরী কত হওয়া উচিত জানা নেই—যা হয় একটা বলে ঠকে যেতেও রাজী নয় ! ওরাই বলুক—শেষে বলে কয়ে একটা দাঁড় করান যাবে যাহোক।

রফা হয় ছ'আনায়।

এইত রাস্তাটুকু পার হয়ে ওপারে গেলেই ষ্টেশন। ধরতে গেলে ওর বাড়ীর ভারানীর খালের এপার ওপার। দুটো পয়সাও দিত না কেউ এটুকু বোঝায়। তবে হ্যাঁ নৌকো আর মাথা আলাদা বই কী। আলাদা বলেই ত ছ-আনা। কোনরকমে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারলেই ছ-আনা। কিন্তু—কুলীগিরি করবে শেষ পর্যন্ত ? এই জন্যেই কী দেশ ছেড়ে আসা ?

কিন্তু ছ-আনা পয়সাও কম নয়। ওসব বড় বড় চিন্তাত মাথার মধ্যে রাতদিনই কিলবিল করছে কিন্তু তাতে পেটের কতটুকু ভরছে ?

কমল দাঁড়া তুই, আমি বেনের দোকান থেকে ঘুরে আসি একবার।

গাড়ীর সময় নেই কিন্তু। আবার নেবে কী ?

কিসমিস নেওয়া হয়নি ত। মাছের দিকে ভাল করে লক্ষ্য রাখিস।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও তুমি।

দীনবন্ধুর দিকে তাকায় সে। সাধ্য কী এর, আমার চোখে ধূলো দেয়—এমনই ভাবখানা।

কোনদিকে খেয়াল নেই দীনবন্ধুর। তার মাথায় পাক খাচ্ছে বড় রাস্তাটা পার হবার চিন্তা। ঝোঁকের মাথায় রাজীত হয়ে গেল—ঝাড়া হাত পায় কখন যে চাকার তলায় পড়ে মোরব্বা হয়ে যেতে হয় ঠিক নেই—বোঝা ঘাড়ে! মোট মাথায় নিয়ে রাস্তা পার হবে কী করে ? তবে পথ পার হতে পারলেই ষ্টেশন আর ষ্টেশনে পৌঁছালেই ছ-আনা পয়সা। হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ উঁকি মারে।

কোন ইষ্টিশন বাবু ?

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাহারাদার ভদ্রলোক বলে, নর্থ।

এই ঠেকোর ডা না হুই-ই উই ডে।

এইটে।

ভদ্রলোকের বাক্যব্যয়ের কার্পণ্য থামিয়ে দেয় দীনবন্ধুকে।

পাশের আলুর দোকানের এক ছোকরা দীনবন্ধুর মাথায় টুকরীটা তুলে দিল। বড্ড ভারী! বোঝা মাথায় উঠেছে—ভাববার সময় নেই এখন। মাছের জল মাথায় পিঠে কাঁধে সারা গায়ে টুপিয়ে পড়ছে। এলোমেলো পা ফেলে এগোয় সে। বেজায় ভীড়। খালি মানুষ চলতে পারে না তার ওপর বোঝা! থেমে পড়ে, পিছনের

তাড়া খেয়ে এগোয় আবার। এখনো জানে না বোঝা যখন মাথায় ওঠে তখন সামনের বাধা দলে পিষে যাবার হক আছে ওর। বাজার থেকে বেরিয়ে এসেই মনে হয় জগদ্দল পাথরের মত বোঝাটা বুক পর্য্যন্ত চেপে বসেছে। গলাটা বুঝি বোঝার ভারে বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। আরো জোরে পা চালায়। সারা দেহ মাছের জল আর ঘামে ভিজে সপসপে।

একশো পাঁচটাকা মণ। বিয়ের লগনশা। শোনে দীনবন্ধু। বিয়ে বাড়ীর মাছ? সে মুটে কেবল? দীর্ঘশ্বাস ঘুলিয়ে ওঠে—বোঝার চাপে বেরুতে পারে না—বুকের মধ্যে আটকে অশ্বস্তি বাড়ায়।

ষ্টেশনে টুকরীটা কে একজন নামাতে সাহায্য করল। টুকরীর পাশেই বসে পড়ল দীনবন্ধু। কপালের ঘাম কাপড়ে মুছে হাঁপায় বসে বসে। নড়বার শক্তি নেই—জুল জুল করে তাকায় বসে বসে। কেউ দেখে ফেলল না ত? নিজের পুঁটলিটা তাড়াতাড়ি মাছের টুকরী থেকে বার করে নেয় দীনবন্ধু। মজুরীর পয়সা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে হাতটা টেনে নিতে ইচ্ছা হয়। পারে না। চকচকে দু'আনি তিনটে। হঠাৎই লোভ এসে গলা চেপে ধরে তার। আর দুগ্‌গো পয়সা দ্যান বাবু—বড্ড ভারী। ভাবে বিয়ে বাড়ীর বাজার, বিয়েতে কত পয়সাই ত খরচ হবে। খুশী মনে ভদ্রলোক আর কিছু ধরেও দিতে পারে।

আবার পয়সা কিসের? ভারী বলেই কুলী করা। নয়ত পয়সা কী পকেটে কামড়াচ্ছিল? ব্যাটাদের কিছুতেই মন ওঠে না।

ওরা আর কিছু বলে না—এ সম্পর্কে সব কথার অবসান করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে দরকারী কথা আলোচনা করে। দুটোর মধ্যে মাছ পৌঁছানো মুস্কিল। বরযাত্রীদের লাস্ট ট্রেন ধরাতে বেগ পেতে হবে। গাড়ী দেয় নি প্লাটফর্মে। নির্ঘাত লেট হবে। কিছু বরফ এনে মাছে দিয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। উত্তর

পাড়ার পিসী এলো না। লাটুদা—এসবের মূলে লাটুদা। বাবা কত করে লিখেছিল এই এবাড়ীর শেষ কাজ তবু…

দীনবন্ধু বোঝে আর আশা নেই। ওদের বাড়ীর শেষ কাজ—তাতে কী? সে ঠিকে মজুর তার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিতে কারো কিছু এসে যায় না—কিছু না। কত জিনিষই উদ্‌বৃত্ত হবে—নষ্টও হবে কত বিয়ে বাড়ীতে—তাহোক তবু সে আর দুটো পয়সা…সংসার করতে হলে দয়া দাক্ষিণ্যও হিসেব করে করতে হয়।

একটু হাওয়ায় সরে গিয়ে বসে সে। নড়বার শক্তি নেই যেন। উরু দুটো জমানো পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে, ঘাড়টা কচে গেছে—নড়াতে পারছে না এরই মধ্যে। পয়সা ছ-আনা আঁচলে বেঁধে কাঁকে গুঁজে নেন। জীবনে প্রথম কালিগিরির পয়সা—তাও যদি চোর বাটপাড়ে নেয়…ঠিক যে কতটা অমঙ্গল হবে বুঝতে পারে না দীনবন্ধু। তবে উপলব্ধি করে যে এ ছ-আনা পয়সার যা মূল্য তার কাছে ক্ষতির পরিমাণটাও হবে ঠিক সেই পরিমাণই। ঘাড়ের ব্যথাটা ভাবনা ধরায়—শানিয়ে দেবে'খন খানিক পরেই।

মাছ দুটো বেশ বড়। দশ এগার সের হবে একেকটা। একশো পাঁচ টাকা মণ—আশ্চর্য ব্যাপার। ওর পুকুরে অমন কত মাছই ছিল দেখে এসেছে—রুই কাতলা পাঙাশ ঢাই—আরও কত পদের। টক টকে লাল রুইগুলো—সিঁদুরমুখী কাড শামেঘের মত। ল্যাজ উলটিয়ে যখন ঘাই দিত…এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দীনবন্ধু। গ্রীষ্মের দুপুরে গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে গাছতলায় বসে কতদিন দেখেছে সে…খানিকটা জলের তলায় ঝাঁক বেঁধে খেলা করে বেড়াচ্ছে!

মাছের দর একশো পাঁচ—সে কী কম টাকা! এক পালি টাকা। পুকুরে অমন কত একশো পাঁচটাকার মাছ ছিল তার।

নিঃস্বতার গুহার আঁধারে বসে ভাবে সে—কত ছিল তার, কত খানি ছিল কিন্তু তখন মনে হয়েছে—এ কিছু নয়—কিছু নয়! ধান

জমি চাই আরো কয়েক কানি—বাড়ীটা হওয়া চাই টিনে ছাওয়া। এমন কত বায়নাক্কা।

সেদিন কজন ভদ্রলোক গল্প করছিল—শুনল দীনবন্ধু। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়েই সারদাকে ও খবরটা দিল, একবছরের মধ্যেই এণ্ডিয়া-পাকিস্তান এক হয়ে যাবে। ঠিক আগে যেমনটি আছিল। যার তার কথা নয় মস্তবড় সাধু একজন—তিনিই বলেছে।

সারদা কিছু বলেনি। শুনেছিল। সাধুসন্তর কথা যখন বিশ্বাসও করেছিল বই কী। বিশ্বাস করেছিল চেষ্টা করে। সাবের ফকিরের দরগায় চিনি মানত করেছিল। বাড়ীর একমাল্লাইখানায় ছই খাটিয়ে হাওয়া থাকলে বাদাম দিয়ে বেরিয়ে পড়বে কানাইকে নিয়ে —তিনদিন লাগবে যেতে। গণ ভাল থাকলে আরও আগে যাওয়া যাবে। কিন্তু কানাই কী অতপথ একলা যেতে পারবে? বাপবেটা দুজনে গেলে মহা ঝামেলা—ভিটেয় আর কিছুটি থাকবে না। সমদ্দার বাড়ীর জ্বালায় কিছু কী আর রেখেঢেকে খাবার উপায় আছে। লাউ চুরী করবে—তা যাবি যা বাপু লাউ নিয়েই ক্ষান্ত দে। গাছের ফল আবার হবে—তা ত হবার জো নেই গাছ শুদ্ধ কেটে নিয়ে যাবে। কেউ বাডী না থাকলে ত মজা ওদেরই। বাড়ী একজনের থাকতেই হবে। একটা হপ্তা-ত—কানাই-ই থাকবে বাড়ী। মাতব্বরকেই টেনে নিয়ে গেলে হবে। ফেরবার সময় বাদাম খাটিয়ে দিলে আর কতক্ষণ—চার ভাঁটির পথ বই নয়। অসহ্য কষ্ট আরম্ভ হয় বুকের মধ্যে। কতদিন নৌকায় চড়েনি সে—গহনজলে ডুব দিয়ে স্নান করেনি কতোদিন। গ্রীষ্মের বিকেলে বুক পর্যন্ত স্রোতের জলে ডুবিয়ে বসে থাকা। কত গ্রাম কত গঞ্জ ছুঁয়ে কত ক্ষেত ধুয়ে এসেছে সে জল। নিজের পায়ের পাতাটা পর্যন্ত গলা ডুবুডুবু জলে দাঁড়িয়েও দেখা যায়!

কপালের চিবুকের মিনমিনে ঘাম কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে আপন মনে আগামী দিনের কত ছবিই আঁকে দীনবন্ধু—একের

পর এক আঁকে। একটা ছবিই বিশবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিশটা দৃষ্টিকোন থেকে। আজ সে পরের বাড়ীর বিয়ের মাছ বইবার কুলি—তা' হোক, আর কদিনই বা। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মনে মনে বহুবার করা হিসেবটা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়। সামনের চাষটা শেয়ালদার বাড়ীতে বসেই মাটি হবে তারপরের চাষে নিজের জমিতে লাঙ্গল নামাতে পারবে সে। আষাঢ়ের কালো আকাশ চিরে ঝিলিক দেবে বিদ্যুৎ; মাঠের ধারে খালের বাঁধে দাঁড়িয়েই দেখতে পাবে দীনবন্ধু—নালাম্বরী শাড়ীর একপ্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টেনে ফালা করে ফেলল কেউ। জোয়ারে ফাঁপা সাগর জলের ঠেল খেয়ে ভারানী খালের জল দুরন্ত ছেলের মত খলখলিয়ে হাসতে হাসতে নারকেল গুঁড়ির ঘাটলার ধাপ একটার পর একটা লাফিয়ে টপকে উপরে এসে উঠবে। জোয়ার আর স্রোতের জলে ঠোকাঠুকী লেগে কোথাও জাগবে ঘুর্ণি, কোথাও উঠবে হলফা—ভিন্নমুখী দুই জলধারার সংঘর্ষে সৃষ্ট হবে তুফান। উঠবে জোয়ার।

জল নামবে। বৃষ্টি হবে। পুকুর ডোবা ভাসবে—মাঠ ডুববে। শক্ত মাটি মাখাছানার মত নরম হবে—চন্দনের মত মোলায়েম হয়ে মাখনের ডেলার মত গলে গলে যাবে বড় বড় চাঙড়গুলো। হৈ-হৈ আনন্দ—আদিম উত্তেজনা—বৃষ্টি নেমেছে। গরুর হাম্বা, মানুষের চিৎকার, মেঘের গুম্ গুম্ নদীনালার খলখল ছলছল—একাকার। একাকার আবহ উল্লাস। ল্যাংটা ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত মায়ের চোখে ধূলো দিয়ে পথের উপরের জলধারায় বাঁধ দিয়ে আনন্দে হৈচৈ করছে আবার সেই বাঁধ ধুয়ে গেলে দ্বিগুণ উল্লাসে মেঘের গর্জনকে পর্যন্ত ডুবিয়ে দিচ্ছে। পুকুর ভরছে, খানা ভরছে—নদীনালা উপচে জল এসে রাস্তায় উঠে হট্টগোল লাগিয়ে দিয়েছে। গাছের পাতার রুক্ষতা ধুয়ে গিয়ে সজীব শ্যামলিমা ছেয়ে গেছে

বনবাদাড় নদীর তীরের প্রহরী কালো রেখায়।

ভাবে দীনবন্ধু—মানুষ ত মাটির বত্রিশ নাড়াতে বাঁধা। তার সুখ তার দুঃখ তার আশা তার নৈরাশ্য মূলত ঐ মাটির উৎপাদনকে ঘিরে। ঐ উৎপাদনকে ঘিরেই হাসি আবার ঐ মাটির ব্যথতায় কান্না। মানুষের কান্নার সব খানিই প্রায় শুকনো মাটিতে জল পড়ে যে ঝাঁঝাল গন্ধ ওঠে তারই মত—হাসির সবটুকুই যেন নতুন বর্ষা পাওয়া ধানের চারা, তার শিরায় শিরায় প্রাণচাঞ্চল্য।

প্রথম ফসল তুলেই কানায়ের বিয়ে দেবে দীনবন্ধু। বিয়ের বয়সও হল—গোঁফ উঠেছে কী আজ— যেবার দেশ ছাড়ে সেবার। এত বড় হয়ে গেছে সেদিনকার কানাই? আশ্চর্য হয়ে ভাবে দীনবন্ধু। ওর বিয়ের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে যায়—কানাই হবার তিনবছর আগের ঘটনা; তবু যেন পরশুর কথা। আত্মীয় কুটুম্বে গিজগিজ করছে বাড়ী। ঢেঁকীশালে একটা বাড়তি ঢেঁকী পেতে দুটো ঢেঁকীতেই ভোর থেকে চিঁড়ে কোটা হচ্ছে। রামচন্দ্রের মা ত সমানে মুড়ী ভাজতেই আছে – ফাঁকে ফাকে দুচার খোলা খইও ফুটিয়ে নিচ্ছে। মাছ ধরা হচ্ছে রোজই—সে যে কটা কতটা তার কী আর গোনাগাঁথা না লেখাজোখা আছে। হরদম ধরছে। পাক-শুদ্ধের দিনই খিড়কী পুকুরে পাঁচটা রুইমাছ আর ভেটকী ধরা হল একটা। কে জানে কতটা হবে মোটমাট। কে আর ওজন করে দেখেছে। মাছ কে দেখত ওজন করে? দাঁড়িপাল্লায় মাছ ওজন—না তখনকার বুড়োধুড়োরাও ভাবতে পারেনি কোনদিন—দেখা ত দূরের কথা।

কানায়ের বিয়েতেও সে ঠিক তেম্নি ধুমধাম করবে। ছেলেও ঐ একটাই। এ বাবুরা দুটো মাছ নিয়ে যাচ্ছে—বিয়ে বাড়ী বলে বোল, ও আর কজনের খোরাক। ক্ষীরছড়ির সুরেন বৈরিগীর মত জন তিনেক ব্যাটার পাল্লায় পডলে মাছ ত মাছ পাঁশগাদা থেকে আঁশ গুলোনেরও তলব পড়বে। খেতে পারে বটে বৈরিগীর পো!

পড়ত বাবুরা তেমন খাইয়ের পাল্লায়—হেসে ফেলে দীনবন্ধু, একশো পাঁচ টাকার দর মাছ কিনে আর খাইয়ে যত্ন করতে হয় না। ঐ মুখের বাক্যিতে তামাকটুকুন মিঠে হয়। কানায়ের বিয়ের পাকা কথার দিন ও মাপের মাছ খান তুই ধরাবে পুকুর থেকে। তবে খুব বাড়াবাড়ি করা চলবে না—এই তিন বছরের ঘা শুকুতে সময় লাগবে। বাড়াবাড়ি করবে কী মরতে? বুঝে না চললে ঘরসংসার করা চলে না। সে দেখা যাবে রমলার বিয়ের সময়। পরের ঘরে পাঠাতে হবে মেয়েকে, কিছু খরচপত্তর করে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে বই কী। মেয়েও ত ঐ একটা বই নয়। ভাবনা যত ঐটের জন্যেই। ছেমড়া আবার যা তা দিয়ে ভাত খেতে পারে না। দেশঘরের বাড়ীতে ভাবনা ছিল না—এদিক থেকে উড়িষ্যায়ও অসুবিধা হয় নি তেমন—শোর গাড্ডায় পড়েছে এই শেয়ালদার বাড়ীতে।

ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে কতকটা। দীনবন্ধু আপন মনে বসে বসে চিন্তার জাল বুনে চলে—ভারত-পাকিস্তান ওর স্বপ্নে এক হয়ে গেছে। দেশে ফিরে গিয়ে সে ফিরে পেয়েছে তার ঘরবাড়ী। ফেলে আসা জীবন ও জীবিকা। শারদ সকালের শিশির ভেজা রোদে খালের চারে একটা নারকলের মালা কোলে করে বসেছে রমলা। মালা ভর্তি শিউলিফুল! একটা একটা করে স্রোতে ফেলে দিচ্ছে সে ফুল আর আপন মনেই গেয়ে চলেছে:

শাশুড়ী পুড়িয়ে খাব আমি শাশুড়ী পুড়িয়ে খাব রে-এ-এ।

গানের দলের কমিকের গান। গেয়েছিল কাশীবিশ্বেসের মেজো ছাওয়াল ধীরেন। হাসাতেও পারে ছ্যামড়া। গানটা বড় মনে ধরেছিল রমলার। এণ্ডিয়ায় আসার আগে সারাদিনই গাইত—এণ্ডিয়ায় এসেও দুচারবার মনের ভুলে গেয়ে ফেলত। কিন্তু থেমে যেত তখনি কী ভেবে কে জানে!

রমলার গানের স্মৃতিতে ভর করে ঘরে ফিরে গেল দীনবন্ধু। সব ঠিক ঠিক আছে—যেমনটি ছেড়ে এসেছিল ঠিক তেমনটি। এক-

চুলও এদিক ওদিক হয় নি। তিন বছর ধরে না কাটার ফলে বাঁশের ঝাড় তিনটের তলায় সব সময় যেন অন্ধকার ঘনিয়ে রয়েছে—খালের ঘাটলায় কিছু পলি পড়েছে কেবল। লাল শালুকের পাতার মধ্যে পানকৌড়ি খেলছে। নারকেল তলায় নারকেল পড়ে কত চারা গজিয়েছে কে জানে। উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর স্তনবৃন্তের মত নিটোল পাকা সুপারীগুলো কাঁদি কাঁদি ঝুলছে হয়ত।

হাসে দীনবন্ধু। বড় কষ্টের হাসি। নারকেলের চারা গজিয়েছে! সমদ্দার ভিটেয় যদ্দিন সন্ধে জ্বালাবার মানুষ থাকবে তদ্দিন ও আশা না করাই ভাল। নাড়ার কুটো একটা পড়ে থাকবার উপায় আছে ওদের জ্বালায়। রাতদিন দেখ—ধাড়ী ছাওয়াল সবকটা ঘুরতেই আছে—কার কী পায় সেই তাল! জমিতে এবার বেড়া যা দেবে দীনবন্ধু। মানুষ ত মানুষ যেন ইঁদুর পর্যন্ত গলতে না পারে। পরের খেয়ে খেয়ে লালস বেড়ে গেছে বেটাদের!

চাষ আবাদের ভাবনা। ছেলেমেয়ের বিয়ের ভাবনা। লোক লৌকিকতার ঝামেলা—গৃহীর সহস্র চিন্তায় ডুব দিয়েছে দীনবন্ধু। নাথারকান্দিতে যেন ফিরে গেছে আপতত যাযাবর দীনবন্ধু দাশ। ভারতীয় নাগরিক দীনবন্ধু দাশকে তার ঠিকানা বা পরিচয় জিগ্যেস করলে গড়গড় করে বলে যায়—দীনবন্ধু দাশ পিতা নটবর দাশ সাকিন নাথারকান্দি থানা—

বরিশাল জেলার নাম না জানা কোন গ্রামের কুলজী মেলে ধরবে দীনবন্ধু। যাযাবর সে নয়, হতে চায়ও নি তবু তাকে বেদের টোল ফেলে এখানে ওখানে বেড়াতে হচ্ছে। সে যেন একটা কক্ষচ্যুত প্রজ্বলিত উল্কা বিপরীত দিকে ছুটছে, কোন এক অদৃশ্য শক্তির টানে, কিসের যেন অমোঘ নির্দেশে। ছুটতে বাধ্য করা হচ্ছে তাই ছুটছে। যার ওপর নিজের অভ্যাস আর সংস্কার ছাড়া আর কারো মাতব্বরী খাটে না সেই মন চাইছে—স্বপ্ন দেখছে হারানো কক্ষ ফিরে পাবার! বাস্তব আর স্বপ্ন মিলিয়ে মানুষের মন—কিন্তু এই বাস্তব ও স্বপ্নের

টানা পোড়েনের মাঝে কোথা থেকে একটা উড়োখেই এসে সমস্তটাতে জট পাকিয়ে দিয়েছে। মাকড়সার জালে পড়া পতঙ্গের মত ছটফট করছে দীনবন্ধু—দীনবন্ধুর মত আরো হাজার হাজার মানুষ। শিয়ালদায় কাশীপুরে, শাবণপুর বাগজোলায়, ধুবুলিয়ায় শিলচরে, কাটোয়ায় কাটিহারে! দিনান্তে সবার মনে ঐ একই প্রত্যাশা ছায়া ফেলে—ইণ্ডিয়া পাকিস্তান একীভূত।

শিয়ালদহের ভীড়ের মাঝখানে নির্জন দীনবন্ধু বসে থাকে। বৈদ্যুতিক ঘড়ির বড় কাঁটাটা ত্রিশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর সর্বশরীরে ঝাঁকুনী দিয়ে পৃথিবীর পরমায়ু গ্রাস করে আর থামে—থামে আবার পরবর্তি আঘাতের জন্য তৈরী হতে। তাড়া খাওয়া মানুষ ছুটছে—ঐ আঘাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যই পৃথিবীর যত ব্যস্ততা। ব্যস্ত নয় নাথারকান্দির দীনবন্ধু দাশ—ঘড়ির কাঁটা ওকে নিয়ে চলেছে জীবনের দিকে, বছর শেষের সেই দিনটির দিকে! যেদিন তার সকাল হবে নাথারকান্দিতে!

মুখটা একবার মুছে নেয় দীনবন্ধু। ঘাম শুকিয়ে নূন জমে গেছে চামড়ায়। ঢেউএর পর ঢেউ আসছে যাত্রীর। গাড়ী আসছে যাচ্ছে। হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি। কত মানুষ! এত মানুষ থাকে কোথায়? আসে কোথা থেকে? কী করে সবাই? আশ্চর্য হয়ে মাঝে মাঝে শুধু তাই-ই ভাবে দীনবন্ধু। আর ভাবে সবাই কী তার মতই নিজের কথা ভাবে? ভাববে কখন? অত দৌড়াদৌড়ি করলে কী ভাবা যায়? দীনবন্ধু কী ভাবতে পারত যখন নাথারকান্দিতে ছিল? অবশ্য অত সাত-পাঁচ ভাববার দরকারই বা ছিল কী তখন? কিছু নয়—তৈরী রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া, ভাবতে লাগে কী?

ষ্টেশনে যাত্রীর ভীড়, উদ্বাস্তুর জনতা। যাত্রীরা ব্যস্ত গাড়ীর জন্য। হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি টিকিট কুলী আর নয়ত হারানো সাথীর জন্য। মাঝে মাঝে মাইকে মিহি গলায় গাড়ী ছাড়বার ঘোষণা। টিকিট ঘরটার সবকটা জানলায় কিউ। বিশেষ করে কোন কিছুই দীনবন্ধুর

চোখে পড়ছিল না। নিরুদ্দেশ্য দৃষ্টি দিয়ে ষ্টেশনটার সামগ্রিক রূপই দেখছিল সে। বনগাঁ লাইনের টিকিট ঘরের কাছে হঠাৎই দৃষ্টিটা আটকে যায় তার। রমলা না? রমলাই ত। দপ্ করে জ্বলে ওঠে দীনবন্ধুর চোখদুটো। এক ভদ্রলোক কী যেন একটা দিল ওর হাতে। আরকজনের কাছে হাত পাতল সে—মুখ খিঁচিয়ে যেন তেড়ে এল ভদ্রলোক। ভ্যাংচাল রমলাও। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে ওঠে দীনবন্ধুর। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে উঠল—সারা ষ্টেশনটা যেন চোখের ওপর নাচতে লাগল, তবু থামল না সে। এলোমেলো পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে রমলার হাত চেপে ধরল সে। রাগে উত্তেজনায় দীনবন্ধু কাঁপছে তখন। প্রথমটায় রমলা একটু হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল, সামলে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। একবার কেবল ছাড়া পাবার অপেক্ষা—দে ছুট্।

হাতে কী দেখি। ওর সরু কচি হাতখানা শাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে দীনবন্ধু। রমলা মিছেই টানাটানি করে। মুরগীতে যেমন ব্যাং মুখে ধরে ঝটকা মারে দীনবন্ধু তেমন ঝটকা মেরে থামিয়ে দেয় ওকে। হাতে কী দেখা কলাম। বললে ও।

কিছ্যু না। রমলাও দৃঢ়তা প্রকাশ করে। শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে হাত ছাড়িয়ে পালাতে। ঠাস করে মেয়ের গালে একটা চড় মেরে দীনবন্ধু তার মুষ্ঠিশুদ্ধ হাত খুলে ফেলে। যা ভেবেছে তাই! কিছু পয়সা। কেড়ে নিল পয়সাগুলো। তারপর পোঁটলাটা তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল সে। একটু যেন ব্যস্তভাবেই। নিজেই নিজেকে তারিফ করতে চেষ্টা করতে লাগল এই অভিনব প্রণালীতে মেয়েকে শাস্তি দেবার জন্য। ধরে দুঘা মারলেই যে শাস্তি দেওয়া হয় এমন কথা তো আর কোন শাস্তর পুরাণে লেখে নি। হয়ত ধরে মারত ও কিন্তু—বেশ ভেবে দেখে দীনবন্ধু—পয়সা এগারোটাই সব ভণ্ডুল করে দিল। আখার আগুন থেকে বিড়ি ধরাতে ধরাতে একবার ভাবল সারদাকে বলে ব্যাপারটা—তারপর কী যেন ভেবে বলল না।

নাঃ বলা চলবে না। কাছাখোলা জাত—এখুনি কেঁদে চেঁচিয়ে শহরডা মাথায় নিয়ে নাচবে! মেয়ে ভিখিরী হচ্ছে তা ত আর দেখবে না—দীনবন্ধুর বংশের মুখ পুড়বে তাতে ওর কী! মা মেয়ে এককাট্টা হবে এখুনি!

চরকীর মত ঘুরছে কানাই। ছুটন্ত মাকুর মত শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেখানেই চাকরীর কোন গন্ধ পেয়েছে ছুটে গেছে। কাজ তার চাই-ই। প্রথম প্রথম কোন জায়গাই চিনত না। এখন নামগোত্রহীন স্থান ছাড়া সবই তার পায়ের পাতায়। এম্প্লয়মেণ্ট এক্স্চেঞ্জে নাম রেজেষ্ট্রী করতে খরচ করেছে কিছু আর কিছু খরচ হয়েছে সোডাসাবানে। এছাড়া বাদবাকী সব নিখরচায়। ভোরবেলা পান্তা খেয়ে বেরোয়। রাত—আটটায় ফিরে আবার খায় যা হোক—মধ্যবর্তি সময়ে জল আছে কলে। এত পথ ঘুরেও পয়সা আনার পথ খুঁজে পায় নি। রাজাবাজারের শানকল, খালধারের রবার কারখানা, ধরমতলায় মোটর সারাই-এর দোকান—কাজ ত দূরের কথা, ওর সঙ্গে কথা বলবার ফুরসৎ পায় নি কেউ। হেলো দাশ ওরা—রুইদাস সেজে গেছে চিৎপুরের জুতার কারখানায় দ্বারবঙ্গের মালিকের কাছে, পাত্তা পায়নি নিম্নবঙ্গের কানাই। রেললাইনের গ্যাং খালাসীর চাকরী একটা হত যদি শতখানেক টাকা দর্শনী দেবার ক্ষমতা থাকত তার। এখনো ঘোরে কানাই—তবে আর পুরোপুরী কাজের আশা নিয়ে নয়। কাজ তার হবে না তবু রোজ রাতে খেতে বসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাকে শোনাতে হয় যে আর কটা দিন। কোন এক কল্পিত বাবু তাকে কথা দিয়েছে চাকরী একটা দেবেই—তবে কিনা ব্যবসাপত্তর মন্দা, দুদিন দেরী হবে হয়ত। সারদা কিচ্ছুটি বলে না। নুন ভাতটুকুর সুমুখে ঐ মিথ্যাটুকুর আড়ালে এসে বসে কানাই—সারদা চমকে ওঠে যখন ভাবে…নাঃ, হয়ে যাবে একটা!

যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। ঝুটমুট বাস্তুত্যাগ—বাস্তুদেবতার রাগ হয়েছে, তাই এ তুর্ভোগ কপালে। চিরদিন সমান যায় না—এদিনও শেষ হবে। শেষ যে কী করে হবে তা সারদা জানে না বোঝে না—ভগবান যখন বিপদে ফেলেছেন উদ্ধার তিনিই করবেন। ওর যা করার—চিনি মানত তা ত অনেকদিন আগেই করে সেরেছে। সাবের ফকির সাহেব আর বাবা তিরনাথ মিলে মিশে যা করে এখন।

কানাই যে কোথাওই কাজের আশ্বাস পায়নি তা নয়। পেয়েছে। বড় আশা নিয়েই প্রথম প্রথম হাজির হত—এখন অভ্যাসে যায়, আশা নিয়ে যায় না কোথাওই। কেউ লোক চায় না। আবার যারা চায় তারাও খোঁজ করে অভিজ্ঞতার। মার পেট থেকে কী কেউ কাজ শিখে তুনিয়ায় নামে? তবে? সবার খবরে কাজ নেই কানায়ের, নিজের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম হয় তার। কাজ হবে না! অনেক দিক থেকে ভেবেও কানাই কোন কূল দেখতে পায় না। সে ত বলতে চেয়েছে যে কর্মজীবন যখন সে সুরু করতে চলেছে কেবল তখন অভিজ্ঞতা তার আসবে কোথা থেকে। বরং কিছুদিন শিক্ষানবাশ—নাঃ কেউ শোনেনি ওর যুক্তি। শুনবেই বা কেন? অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব আছে না কী? কাজের অভাব যত বাড়ছে তত অভিজ্ঞ কর্মী বেকার হচ্ছে।

কলকাতায় বা তার সহরতলীতে কোন সুবিধা হবে না বুঝেই কানাই নতুন করে সেজে বেরুল। টিটাগড়ের চটকল, আগড়পাড়ার কাপড়কল, কাঁকনাড়ার কাগজকল পর্যন্ত ধাওয়া করল সে। দিনের পর দিন একদ্বার থেকে অপর দ্বারে ধর্ণা দিয়ে চলে। কিন্তু ওখানেও যে কোন আশা নেই বুঝতে তুচার দিনের বেশী সময় লাগল না তার। ছুতায় নাতায় এক আধজন প্রায়ই ছাঁটাই হচ্ছে। কাজের নামে ঘোরাও হচ্ছে খুব। হদ্দমদ্দ না দেখে ছাড়বে না সে। ফাঁক একটা পেলে হয়!

এভাবে ঘোরাফেরা করাও মহাঝামেলা হয়েছে ইদানীং। বলা নেই কওয়া নেই কোন ষ্টেশনে কোনদিন যে চেকিং বসে যায় ঠিক নেই—মোবাইল কোর্ট। বিচার সঙ্গে সঙ্গে। হবু চন্দরের কথাই মনে করিয়ে দেয়—এবিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন—শ্বশুরবাড়ী আর কী! কথা বাড়ালে জরিমানার অংকও লাফিয়ে বাড়ে। খিটখিটে মেজাজের হাকিম হলে ত কথাই নেই। সেদিন বারাকপুরে এগারো বছর বয়েসের একটা স্কুলের ছেলে—মজা দেখতে কী ট্রেন দেখতে ষ্টেশনে এসেছিল কে জানে। হল পাঁচটাকা ফাইন। কেঁদে ফেলল ছেলেটা—জলখাবারের দু'আনা পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই কাছে—জানালও। দুচার কথায় ফাইন উঠল বিরাশী টাকায় ঠেলে। ওর কাছে পাঁচটাকাও যা বিরাশী টাকাও তাই। কান্না থামল না তার। আইনের মর্য্যাদা রাখতে তার গিয়ে বাইরে দাঁড়ান কয়েদী গাড়ীতে উঠতে হল। সাত দিনের জেল। তবে কানাই ত আর পোলাবান নয়। কায়দা সেও জানে। ওকে ধরা অত সহজ নয়। ক্যানভাসার আর ব্ল্যাক অওলাদের কাছে খোঁজ নিয়ে ঠিক জায়গায় নেমে পড়ে ওদের সঙ্গে নামে আরো অনেকেই। পিছনে হয়ত গাড়ীর মধ্যে কারা বলাবলি করে শুনতেও পায়। স্বাধীন ভারতের জামাইরা এবার অবতরণ করলেন বোসবাবু। নিন এবার একটু কোমর ছড়িয়ে বসুন।

কানটা অপমানে এবং রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কিন্তু সকাল বেলা কারুরই ইচ্ছা করে না ঝামেলা বাড়াতে। উৎপাত যখন আরম্ভ হয়েছে দিনটাই মাটি! পথে পথেই কাটবে! তার ওপর আবার—

ভোরে বেরোয়। রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দেয় সারদা—অর্ধেক দিন নিজের ভাগের অর্ধেকে। আমানীতে ভাত ডুবে থাকে খুঁজেপেতে বার করতে দেরী হবে—খানিকটা নুন গুলে দিয়ে আগে আমানীটা চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়ে কলাইচটা শানকীর তলায় পড়া ভাতকটা কাঁচা লংকা সিদ্ধের টাকনা দিয়ে খেয়ে নেয়। খাওয়া যায়

এত সকালে! তায় আবার ভাত—তাও গরম নয় পান্তা! হ্যাঁ পান্তাই অমৃত লাগত যদি ওর সঙ্গে থাকত গরম গরম দুখানা মাছভাজা —ইলিশ কি ফ্যাঁসা নিদেনপক্ষে চিংড়ি! খেতে বসে যেদিন মাছের কথা মনে হয় ভাত আর গলা দিয়ে নামে না। ভাতের আস্বাদই যেন বদলে যায়। অভুক্ত ভাতে আরেকটা শানকী চাপা দিয়ে উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছিও একযোগে উড়ে ওঠে; নকলকে সাপের ফণা মাটিতে আছড়ে পড়ল যেন, সবটুকু বিষ ঢেলে দিল। কানাই ফিরেও তাকায় না। পিতলের খেরো ঘটি করে সে তখন লাইনের ওপরই হাত বাড়িয়ে হাত ধুচ্ছে হয়ত।

চার নম্বর প্লাটফরমে রোজই এসময় দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ীটা। পিলপিল করে মানুষ প্লাটফরমে ঢোকে—গাড়ী ভর্তি হয়ে গেছে অনেক আগেই—এখন সবায়ের চেষ্টা একটা নিরাপদ হাতলের সন্ধান পাওয়া। কোন রকমে একবার ঠ্যাংটা কোথাও গলাতে পারলে···

কারখানার মজুর সব। এগাড়ী ফেল করলেই আধদিন নাগা। আধদিনের মাইনে কাটা যাবার থেকে দেহের কোন অঙ্গের আধখানা লাইনে কেটে পড়ে থাকাটাও বোধ হয় লাভজনক। হয় জীবন নয় মৃত্যু—মাঝামাঝি রফা নেই এর মধ্যে। এমনিতেই হপ্তার মাঝখান থেকেই তেল আনতে নূনের পাত্র শূন্য হয় তার ওপর যদি আধারোজ কাটা যায় ত—উপোষ, সপরিবারে অন্তত একবেলা নির্ঘাৎ বাড়তি উপোষ। তার চেয়ে—

অত ভেবেচিন্তে না করলেও এ ঝুঁকি নিতেই হয় বাধ্য হয়ে। চাকরী করতে হলেই ট্রেনে উঠতে হবে আর ট্রেনে ওঠা মানেই মৃত্যুর সঙ্গে রফা করা—না-না মৃত্যুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে কোন সীমারেখা নেই; দুই-ই সমান। জীবন আছে সেজন্যই খাটতে হবে—খাটবার উপায় বার করতে হবে; মরণ যেদিন এসে যাবে তাকে দেখে মুখ ঘোরাবে না কেউ। হয়ত খুশী হবে অনেকে—খুশী হবে এতদিন মরণের চোখে ধূলো দিয়ে জীবনটাকে

চেটে মুছে ভোগ করল বলে। অন্য কোন লাভের আশা নেই যখন বেঁচে থাকাটাই লাভ।

লেডি ক্যানভাসার। ওরা বলে মাগী ক্যানভ্যাচার। ধূপ। কোথাকার কোন নারী কল্যাণ সমিতির উৎপাদন। নারী কল্যাণের নমুনাটুকু ক্যানভাসার মহিলার সর্বাঙ্গে ফুটে রয়েছে। অপুষ্টিক্লিষ্ট অঙ্গের কোথাও কোন ভাঁজ নেই, কোন খাঁজ নেই। যতটুকু না থাকলে প্রাণটা থাকে না তার চেয়ে একটুও বেশী কিছু নেই বোধ হয় সেই দেহে। তন্বুকা নয়। নয় তন্বী। বয়স হয়ত বাইশে পৌঁছেই একদৌড়ে চলে গেছে পঞ্চাশের দোর গোড়ায়। বছর গুনে বয়সটা বাইশ হতে পারে. চোয়ালে প্রাচীনার বলিচিহ্ন। উদ্যত হনু। চোখ দুটো শুধু জ্বলজ্বলে। কামাতুর যক্ষ্মারোগীর মত জ্বলজ্বলে। একঝাঁক রুক্ষচুল স্বল্প ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে সেই চোখ দুটোর কাছে এসে নাগশিশুর মত হিস হিস করে মাথা দোলাচ্ছে। মাঝে মাঝে কানের পাশে ঠেলে দিয়ে ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিচ্ছে অনভ্যস্ত হাতে। কে জানে সত্যিই বিধবা কিনা। সিঁথেয় বোশেখী মেঠো পথের মত রুক্ষ কর্কশ রিক্ততা। কুমারী হওয়াও বিচিত্র নয়। ঘোমটাটা শুধু আড়াল মাত্র—নারীমাংসের লালসা-মাখা চোখের ঔৎসুক্যকে ধোঁয়াটে করে দেওয়া।

লজেন্স—প্যারী কোম্পানীর—ক মিষ্টি—

বলবেন স্যার···দাঁতের ব্যথা, দাঁতে পুঁজপড়া, কনকন করা······

অবধৌতিক মাজন আছে—খাঁটি দেশী গাছ গাছড়ার ছাল থেকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত·········

রশি—আজ্ঞে না গলায় দেবার রশি নয়············

বাদাম·········

চা গরম···গরম চায়············

কাল শালা ল্যাংড়া ফোরম্যানের সঙ্গে চার্জম্যানটার যা জব্বর একহাত হয়ে গেল মাইরী।

যাত্রী, ক্যানভাসার, হকার পকেট মার—একাকার। মানুষের দলা—ভীড়—মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মিছিল। যুগ যুগান্তরের যুগসন্ধির পুনরাবর্তন।

আগরবাত্তি ধুপ আছে—উদ্বাস্তু নারীকল্যাণ সমিতির……… বিশ্বের অবসাদ ভীড় করেছে মেয়েটার মুখে। কেবল উদ্ধত হনুতে বাঁচার ব্যগ্রতা। ভ্রূক্ষেপও নেই কোনদিকে মেয়েটার। তুবেঞ্চের মধ্য দিয়ে নির্বিকার হেঁটে চলে সে। বসে আছে যারা তারাই সংস্কারবশে হাঁটু টেনে নয়। মেয়েছেলে ত। হোক না তা কেবল মাত্র ব্যাকরণিক অর্থে! ওর পথ করে দেয় আর বিরক্ত হয় সবাই। অভিশাপ দেয়। কাকে তা কে জানে তবে ওকে নয়। প্রত্যেককে এই ভাবে চলার পথ করে দিতে দিতে ফিঁক ধরে যাবে পেটে। ভীড়ের চাপে পেটের ভাত এমনিতেই চাল হয়ে উঠেছে তার ওপর এই উৎপাত।

মনে হয় উৎপাত কিন্তু কারো কিছু করার নেই। নিরুপায় যাত্রীরা ক্যানভাসারদের ক্যানেস্তারার গুতো খেয়ে বিরক্ত হয়। প্রতিবাদ করতে পারে না। ওদের কালীপড়া চোখের কোলে চোখ পড়ে গেলে সব গোলমাল হয়ে যায়। কথা জোগায় না। নির্দোষ অপরাধীর মত এক ধরণের জান্তব চাহনী।

একদিন বাঁচবার জন্যই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছিল। সংহতিই তাদের নিশ্চিহ্ন হতে দেয় নি। ভয়াবহ বিরূপ প্রকৃতির বুক থেকে প্রাণ ধারণের মৌলিক উপাদান ছিনিয়ে এনে প্রয়োজনানুপাতিক বাঁটোয়ারার জোরেই বেঁচেছিল। রাষ্ট্রপতি আর ধারু বাগদীর কোন পুর্বপুরুষে একদিন সন্ধ্যায় জ্বলন্ত আগুনের সুমুখে বসে সারাদিনের পর নিজেদের ভাগের একটা খরগোস ঝলসে ভাগ করে খেয়ে বেঁচে গিছল—বেঁচে যাবার সময় তারা ভাবতেও পারে নি এদিনের কথা। মানুষই মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় শত্রু। দৈব মূক। দৈব বরাবরই মানবিক শক্তির দাস—অন্ততঃ যেদিন থেকে মানুষের মরণকাঠি

পৈশাচিক লুব্ধতার মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে সেদিন থেকে ত বটেই।

ইতিমধ্যে মাজনের ছোকরা ক্যানভাসারটি ঘোষণা করল যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তার কোম্পানী সিকিদামে মাত্র একমাসের জন্য তার ঐ সর্বরোগহর দাঁতের মাজনটি লাইনে ছেড়েছে। মাত্র এক আনা। নড়া দাঁতও পাহাড়ের মত এঁটে বসে পড়বে।

কে একজন চাপাক্ষোভে বলল। শালা ফোর টুয়েন্টি!

তারই কথায় আরেকজন প্রতিধ্বনি করে। ছেরেপ খড়ির গুঁড়ো মশাই। তুচিমটি ফিটকিরি দিয়ে আদ্যাশক্তি মাজন! গালে চড় মেরে—গাঁট কাটা আর বলে কাকে।

আইন করে এসব বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

থামুন মশাই আর ঘেন্না ধরাবেন না। চার পয়সার মাজন—যা আছে ওতেই আছে, খড়ি থাকে খড়ি ছাই গুঁড়ো থাকে ছাই গুঁড়ো —দাম ত চার পয়সা। দাঁত ও তুটোতেই সাফা হয়—কিন্তু ষ্ট্রেপটো-মাইসিনের ফাইলে যখন—

আর বলেন কেন! ধরা পড়ল, কেস হল, হাকিম বলল পাঁচশো টাকা ফাইন ছাড়া আর কিছু করার হাত নেই তাঁর। আইনে নেই। ভেবে দেখুন ত কেন নেই? পেনিসিলিনের কেলেংকারীর কথাটা ত সিডিশন? কী রামরাজত্বি রে বাবা!

আরো গড়ায়। মুখপাতের প্রতীক্ষায় ছিল যেন সবাই। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর বিরক্তির বিষ উজাড় করে দেয় যে যতটুকু পারে। কানাই বোঝে না এসব। সে কেবল তাকিয়ে দেখে ক্যানভাসারদের কাজ। বিশেষ কিছুই নিচ্ছে না কেউ তাতে কী। গলার শির ফুলিয়ে কেউ বা স্বর বিকৃত করে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সমানে। লজেন্স, পাঁউরুটি আনায় পঁচিশখান সুচ. দেশী শেভিং ব্লেড, খেলনা ঝুমঝুমী, চিরুণী, তানসেন গুলি, দাঁতের মাজন, আরও কতকি। অন্ধকার ভেদ করে উপরে উঠে আসবার ব্যাকুল ছটফটানি। সেখানে আলো আছে,

আছে অপরিমেয় মুক্ত বাতাস, স্তরে স্তরে সোনালী ঢেউ ওঠা পৌষালী ক্ষেত। নিটোল জীবন—সে জীবন বন্দী নয় হৃতসর্ব্বস্ব নয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই। সে যেন ওদের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। ওদের প্রবহমান জীবনের স্রোতে কি ভাবে ভেসে পড়া যায় ভাবতে থাকে কানাই। হারানো দিন, না পাওয়া দিন নিয়ে এখন স্বপ্ন আর আশার ফুলঝুরী ফুটিয়ে লাভ নেই যে, হাড়ে হাড়ে বুঝেছে কানাই—ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশীপুর ক্যাম্পের দিনগুলো বারিপদা উদ্বাস্তু কলোনীর দিনগুলো। শিয়ালদার বর্তমান—উদয় থেকে অস্ত নৈরাশ্য তবু নিরবসর, অস্তোদয় কশাইখানায় পাশব প্রতীক্ষার ছটফটানি। বিবর্ণ রোদপোড়া দিন উত্তপ্ত লৌহপাশের মত ওকে জড়িয়ে ধরে হেলতে দুলতে সন্ধ্যার দোর গোড়ায় ফেলে দিয়ে বীভৎস হাসিতে ওর বুকের রক্ত পর্যন্ত জমিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছে—একের পর এক। যেন কতদিন—অনন্তকাল ধরে!

অন্ধকাব ভেদ করে উপরে মুক্ত হাওয়া উদার আলোকে বেরিয়ে আসবার ব্যাকুল ছটফটানি অহরহ কানাইকেও টেনে নিয়ে চলেছে। যেখানে নিয়ে চলেছে কে জানে সেখানে নৈরাশ্যের উষ্ণশ্বাসে বাতাস বিষাক্ত কিনা, পৌষালী মাঠের পুরু মন্থর সোনালী ঢেউএ বৈশাখী গৈরিক রুক্ষতা কিনা! এভাবে বাঁচা যায় না—বাঁচতে হলে নিজের কাছে নিজের হীনতা স্বীকার করা যায় না পদে পদে! জীবন চায় ও—যে জীবন বন্দী নয় হৃতস্বর্বস্ব নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই।

টিকিট!

চমক ভাঙ্গে ওর। চেকার। টিকেট চেকার। মূহূর্তমধ্যে বুঝে নেয় ব্যাপারটা। নির্লিপ্তভাবে হাত দেয় বুক পকেটে। রাজ্যের বাজে কাগজ পাট করে সযত্নে রাখা আছে তার মধ্যে। কবে দুপয়সার মুড়ি খেয়েছিল সে ঠোঙাটাও বাদ পড়ে নি।

দুশ্‌শালা! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে দফা সেরেছিল এখুনি! নিজেকে ধিক্কার দেয়, ঠিক হয়ে বসে।

ওদিকে চলে গেছেন চেকার ভদ্রলোক।

কানাই দেখে বসে বসে। চাকরী আবার উপরি। বেশ তুচার আনা পড়ছে পকেটে।...

চিন্তার খেই ছিঁড়ে গেছে। এক—একসময় এমন সব চমৎকার কথা ভাবা যায়! ইচ্ছে করে আর যাই হোক চিন্তা হয় না। ভরাপেটে একটু ঢুল এলেই কত মানুষ ভীড় করে এসে হাসিমুখে হাজির হয়—পলক পড়তে না পড়তেই উধাও।

ষ্টেশনের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কানাই। গাড়ীতে থাকে যতক্ষণ বুকে সাহস থাকে—বড় নিরাপদ, মনে হয় নিজেকে। ষ্টেশনে নামতেই হাঁটু তুটো কেঁপে ওঠে যেন। কতদিন হয়ে গেল এখনো সাহস এল না। কতদিন ভেবেছে অবস্থা একটু ভাল হলে একদিন লালগোলা পর্যন্ত টিকিট কেটে বসবে—দেখবে কেমন লাগে। কেমন লাগে গেটে টিকিট দিয়ে বেরুতে। ষ্টলের আগুণদড়ি থেকে বিড়ি ধরায় একটা—আশিতে মুখটা অন্যমনস্ক ভাবেই দেখে। দাড়িটা কাল আর না কামালে হচ্ছে না—বড্ড বেড়েছে। আবার তুপয়সা খরচা আর ব্লেডগুলোও এমন একবারের বেশী তুবার যদি ভুলেও কামান গেল কোনবার! আধময়লা জামাটা পিঁজে গেছে কজায়গায়। এই একটি জামাই সম্বল। উড়িষ্যায় করানো। তু চার দিনের মধ্যে কোন ব্যবস্থা হল ত ভালই তা না হলে হাঁড়ির হাল!

চনচনে তুপুর। পথের ধুলো চলন্ত বাস লরীর পিছন পিছন ছুটছে। মাটি নয়ত—ছাই যেন। পথে পাথর ঢেলেছে—কাল পাথর—ঢালাই করা পথ। খানিক খানিক পিচ উঠে গেছে। ধারাল পাথরগুলো কোন প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রের ফলার মত বিশ্রী নীল আকাশটাকে ফুটো করে দেবার জন্য মাথা উঁচিয়েছে যেন। তাগছে।

লেভেল ক্রসিংএর পাশেই দোকানটাতে ডাবের স্তূপ। সামনেই

পথ। ধুলোর পাফ বুলান পাথুরে পথ। কত নীচে মাটি কে জানে। সবুজ মাটি, মরে ভূত হয়ে আছে নিষ্ঠুর পৌরুষের পেষণে! যশোর রোড থেকে বি. টি রোড—একছুটে একটা অজগর যেন এঁকে বেঁকে বি. টি রোড পার হয়ে গিয়ে গঙ্গায় মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। জলটা শুষে নেবে। পাশে বাড়ী বস্তি কারখানা মোষের খাটাল। ঠুনঠান ঢং ঢং—পুরণো টিন, লোহায় হাতুড়ীর আঘাত। মরচে ঝরিয়ে যদি কিছু পাওয়া যায়। একটা মোষ পড়ে আছে রাস্তার ধারের নর্দমায়, পিঠের ওপর কিলবিল করছে নোংরা পোকা, কুৎসিত সাদা! যাত্রী ভরা বাস দাঁড়িয়ে আছে একখানা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কানাই। কত বাসই ত দেখেছে এমন ত মনে হয়নি কোনদিন। যেন পুজোর আগে ভারাণীর খাল দিয়ে রসিদ মিঞার চার মাল্লাই চলেছে বেনাপোলের হাটে—বলির ছাগল ভর্তি। বিক্রী হবে! তাও এত গাদাগাদি নয়। তারা তবু মাঝে মাঝে ডাকে হাঁকে, জাবর কাটে, কোন ঘাট বা গঞ্জে এলে ফ্যালফ্যাল করে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে। গণ গড্ডলিকা স্তব্ধ! মৃতের স্তূপ যেন। বারাসতের দিক থেকে কাঠের লরীটা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একখানা পাটের লরী এসে দাঁড়াল পিছনে। চারিদিকে যেন কী একটা আতংকময় আবহাওয়া। রিক্সার ভেঁপু, সাইকেলের টুংটাং, ট্রেনের ভস্ ভস্, মোটরের শব্দ সব মিলিয়ে যেন একটা পলায়নী সুর। যেন কোন শহর ছেড়ে এখুনি পালিয়ে চলেছে সবাই বোমার আতংকে কী বন্যার ভয়ে। স্কুলের বই-এর বিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের ছবিটার কথা মনে পড়ে যায় কানাইয়ের।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে গায়ের জামাটা খুলে হাওয়া খেতে লাগে সে। জামাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস করে।

দোকানদার ঘরের খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। একটা ছোকরা ডাব কেটে দিচ্ছে বাইরে। ডাবের খদ্দের আসে দুচারজন। দাঁড়িয়ে খায়, খুব

কমই নিয়ে যায়। হয়ত বাড়ীতে রোগী আছে কোন। আর বাস বা লরী দাঁড়ালে বিক্রী হয় দুএকটা। যে যার সীটে বসেই খায়। হাত গলিয়ে পয়সা দেয়। যারা কিনে খেতে পারে না তারা নির্লিপ্তের ভাণ করে অন্যদিকে তাকিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

কানাই বসে বসে দেখে। নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই কারো। ব্যস্ত সবাই। একটা বুড়ী হাতে লোহার শিকের আঁকড়ি নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি একটা জরদা পান কিনে মুখে পুরে মাথার ঝুড়িটা ঠিকমত বসিয়ে নিয়ে চলে গেল শহরের দিকে। রেল লাইনের পোড়া কয়লা কুড়িয়েছে। বিক্রী করতে গেল হয়ত। ছুটি হবে কারখানায় এখুনি। গেটে বসবে গিয়ে।

চা বানাও ব্রজ দা—চারটে। বাঁ কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝোলানো, হাতে লজেন্সের জার। মাঝ বয়সী জন চারেক ছেলে।

পয়সাটা ভোদাই দেবে ত?

মাইরী আর কী—আমি মাত্তর সাড়ে তের আনার ব্যবসা করেছি।

তাতে হলটা কী? মাল বেচার সঙ্গে চা খাওয়ানোর সম্বন্ধটা কোতায় রে শালা? তবিল দেখতে গেলে পেটে কিল দিয়ে থাকতে হবে!

উচিত ত ওরই দেওয়া—না দেয় দেখা যাবে'খন।

ঐ বেঞ্চটাতেই বসল ওরা। কানাই যে বসে রয়েছে দেখতেই পেল না যেন। বা ইচ্ছা করেই দেখল না। কানাই এখন সরে বসল। কজম সমবয়সীর সান্নিধ্যে মনটা একটু খুশীও হল বই কী। ওদের মনের উত্তাপ যেন এইমাত্র ওকে আলতো ছুঁলো এসে।

ওরা হরদম বকছে। যেন শোনাচ্ছে আশপাশের মানুষকে। ফেরী করে করে কথা বলা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। বাজার ঢ্যাবঢেবে, লজেন্স ছেড়ে চানাচুর ধরতে হবে···মাসের শেষ পয়সা নেই খদ্দেরদের হাতে।

জল বেচব এবার---নয়ত পাঁউরুটি। ভেণ্ডাররা টানবে। বলল

ভোদাই। বাঁ হাতের ঝাড়া দিয়ে চুলের ঝোপটা ওপরে তুলে দিল সে। মাথাটা চুলকাল। উকুন গুলোরও সময় অবসর নেই!

বিস্কুটেও মন্দ লাভ হচ্ছে না—বাজারটা ভালই। আরেকজন।

—কালার্চাদ আবার কাল থেকে আনায় দশখানা ধরিয়েছে।

—ধরাক। বিক্রী বাড়ান অত সোজা নয়। লজেন্স কী কেউ আর দর করে কেনে—সামনে যাকে পায় তার কাছেই হাত বাড়িয়ে দেয়। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিল সবাই।

কানাই যেন কথাবার্তা গেলে ওদের। ওদের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া দেখে খেয়াল হয় তার নিজেরও খিদে পেয়েছে। খিদে এসময় রোজই পায়। অন্যদিন পথে থাকে, আঁজলা ভরে জল খেয়ে পেট ভরায়। আজ পারে না। কেন যেন বেহিসাবী হয়ে পড়ে নিজের অজ্ঞাতেই। একগ্লাস চা নিয়ে সেও চুমুক দেয়। বেশ লাগছে। মিষ্টি গরম সব মিলিয়ে একটা আরামদায়ক অনুভূতি। মুহূর্তে স্নায়ুগুলো সতেজ হয়ে উঠল।

—লবনচুসে আপনাদের লাভ থাকে কি রকম? বার বযেক ঢোক গিলে সে জিগ্যেস করে।

—কী রে ভোদাই—বল এখন লবনচুসে কি রকম লাভ থাকে। হেসে ওঠে সকলে। অপদস্থ বোধ করে কানাই। ওরা আর করে কী—না হেসে পারে না। বাচ্চা ছেলের মত লবনচুস বললে হাসি না পায় কার?

—থাম বাপু! সবাই তো আর তোদের মত বি-কেলাশ হয়ে ওঠে নি। বলল ভোদাই—কি বলছিলেন? লাভ কী রকম? টাকায় ছ-আনা। বাঁধা রেট। রুটি কিনুন বারো আনা ডজন আঠারো আনায় বিক্রী। জলের ডজন বারো আনা—বিক্রী ছ পয়সা দুআনা। মলম, মাজন বিস্কুট—ঐ এক পড়তা। ক্যানভাসারের জীবনেরও দশআনা মহাজনের সিন্ধুকে বাদবাকী ছ-আনার জন্যেই দৌড়াদৌড়ি—বুঝলেন না।

ওদের প্রথম দিককার ব্যবহারে বেশ ঘাবড়ে গিছল কানাই। ভোদায়ের সহৃদয়তায় সেটা কেটে যায়। ভোদায়ের কথায় আন্তরিকতা। ভরসা পেয়ে আবার জিগ্যেস করে, কটাকা দিন বিক্রী ?

—ওর ঠিক নেই কোন। কপাল নিয়ে কথা—কপাল ভাল থাকলে তুটো লোকাল ধরলেই পাঁচটাকা আবার কোনদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চিল্লে মরাই সার। বিড়ির দাম ওঠে না। তবে গড় পড়তা টাকা পাঁস্যিকে থাকে।

কানাইয়ের আর জানবার কিছু নেই। ভাববারও নেই। বলল, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে লাগি তো কাজটা দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন—আপনাদের জানা লাইন।

এতক্ষণে হাসল ভোদাই। হো হো হাসি। বলল, কেন নিজের চোখকান কী কোথাও বাঁধা থুয়েছেন নাকি ? তারপর একটু সংযত হয়—কেনাকাটার ব্যাপারে একসঙ্গেই থাকবেন, দেখবেন। এক দিনের মকদ্দমা। নিজেই তখন কতজনকে বোঝাতে পারবেন। একটু গাম্ভীর্য এনে বলে, তবে শক্ত হচ্ছে লেকচার দেওয়া। গাড়ীতে উঠে এমন কথা বলতে হবে যেন আপনার মালটাই সেরা—একবার ফসকালে আর জুটবে না কারো কপালে, কথা বিক্রী মশাই কথা বিক্রী—ছেরেপ কথা বিক্রী। মাল ত উপলক্ষ্য। প্রথমটায় লজ্জা লজ্জা লাগবে, গলা বুজে আসবে—বলতে দাঁড়িয়ে কথা খুঁজে পাবেন না। সে তুচারদিন তারপর দেখবেন গড়গড় করে কত কথাই বেরিয়ে যাচ্ছে। একবার এসে গেলে ঠেকানোই মুস্কিল হবে—পাকিস্তানের বন্যা আর কী।

কানাই দমে গেল খানিকটা। তার পর ভাবল কথা বলতে না পারার কোন কারণ নেই—আর কথাগুলো যখন চীনে ভাষায় নয় !

বলল, প্রথম কটাকা লাগবে ?

ভোদাই চোখ পিটপিট করল বারতুই। ভাবল কী যেন। হিসাবই করে নিল মনে মনে বোধ হয়। বলল, আগেই যে টাকা

চালছেন—ব্যাপার কী, লটারী? আগে দেখুন কাজটা ধাতে সইবে কি না তবে ত লগ্নীর কথা।

—দেখতেও মালপত্র চাই ত।

—এখন থাকেন কোথায়?

—বাসার কথা? বাসা নেই, থাকি শেয়ালদায়।

—ইষ্টিশনে? শ্যালদার রিপুজী?

—হ্যাঁ। কানাই উত্তরটা দিতে দিতেই জামার পকেট হাতড়াচ্ছিল। হঠাৎ থামল। ভুলো চিৎকার করে আসুরিক কণ্ঠে গেয়ে উঠল, মোরা বাস্তুহারা ভাই—ই—ই!

এদের সবতাতেই ইয়ার্কি। বিরক্ত হয় কানাই। মনের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা চিন্তা ঝিলিক দেয়—হয়ত ওর সঙ্গে আগাগোড়াই ইয়ার্কি করছে ওরা। কুকুরকে রুটি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত বেত না হাঁকরালে হয়। পকেট থেকে আনিটা বার করে চায়েব দাম মেটাতে যেতেই হাঁ—হাঁ করে উঠল ভুলোই প্রথম।

—আরে আজ দোস্তি হয়ে গেল পয়সাটা আমরাই দোব। কি বলিস ভোদাই?

—সে ত বটেই, তুই শালা পাকা ব্যবসাদার—আজ পুঁইশাক খাইয়ে রাখছিস মওকা মত গোল আলু নিয়ে উশুল করবি।

হাসল কানাইও। ক্ষীণ আপত্তিও তুলল একটা, মানে, খাবো না হয় আরেকদিন আজকেরটা—

পকেটে পয়সাটা বেখেই দিল শেষ পর্যন্ত।

—না আজকেরটা দিয়ে রাখি। সুদের সুদ তস্য সুদ বুঝলেন না—উশুল নেব এই সব শালায়! বলল ভুলোই।

পয়সাটা পকেটে ছেড়ে দিতে লজ্জাই হল একটু কিন্তু এক আনা পয়সা—শেষ সম্বল—বেঁচে যাবার তৃপ্তিও কম নয়।

—আপনার নামটা কি ভাই? ভোদাইএর প্রশ্ন।

—কানাই।

কানাই—কী ? বিশদ জানতে চায় ভুলো।

—কানাই ক্যানভাসার আবার কী ! মল্লিক না হয়ে ভশ্চাজ্যি হলে মাল কী দু'আনা বেশী কাটবে ? কানাই তাও খানিকটা বাড়তি রয়েছে—ওটা কানু হওয়াই ঠিক। আর এই আপনি আজ্ঞেগুলো —বুঝলেন না,—ও যেন কেমন তেতো তেতো লাগে—তুইমুই না হলেও—আপাততঃ তুমি, কী বলিস ভুলো ?

—যা বলিচিস—আপনি আজ্ঞে করলেই মনে হয় শালার প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে দর করছি। লাও—বিড়ি চলে ত ? কানাইয়ের দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে ধরে ভুলো।

—দিন। হাত বাড়ায় কানাই।

—আখ্ খেলে কাঁচকলা। এ শালা আস্ত ভদ্দরলোক ! ওর ভ্যাংচানীতে লজ্জিত হয় কানাই। সংস্কার অপমান বোধ করে। বলে, একদিনে কী ঠিক হয়—কেমন বাধো বাধো ঠেকে।

—আগুন দেরে ভোদাই। একদিনে কী ঠিক হয় ! এ মাল ফুলশয্যের রাতে আপনি আজ্ঞে করে নির্ঘাত মাগের ঠ্যাং জড়িয়ে ধরবে বলে দিলাম এককথা !

একঝাঁক ঘুঘুর পাখার ঝাপটা ওঠে হাসিতে। কানাইয়ের কান গরম হয়ে ওঠে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভোদাই বলে আবার, শেষ পর্যন্ত কী ঠিক হল ? লাগবে ?

ইচ্ছে ত খুব। বলল কানাই। চিন্তান্বিত।

—অতশত ভাবতে গেলে থই পাবে না চাঁদ—এখুনি আমরাও কোথায় যাব তুমিও কোনদিকে হাঁটবে—লাগতে হয় ত লেগে পড়।

—মাল ? মাল পাব কোথায় ? পয়সা কড়ি ত সঙ্গে নেই—মানে জোগাড় তাগাড় করতে হবে। তা—না—

—ওঠ ছেমড়ী তোর বে—ভুলো ওর কথাটা নিজের মনের মত করে শেষ করে দিয়ে হাসে। বলে আমাদের ব্যবসায় পাঁজি পুঁথি

দেখার লাগে না—রাত পৈলে কী খাব তার ঠিক নেই। ও শালার তিথি নক্ষত্তর আকাশময় ঘুরে বেড়াক!

—নে নে যা করবি তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল—নৈহাটী লোকালের সময় হয়ে এল। একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাঁচু।

ন্যাড়া চুপটি করে বসেছিল এতক্ষণ। চোখের কোণে অর্থপূর্ণ হাসি। বলল, শালার যে নৈহাটী লোকালের বড্ড টান রে ভুলো? চোখ দুটো সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে একবার নেচে উঠে ঔজ্জল্য বাড়ায়।

—শুক্কুরবার—ওঃ শালার ঠিক মনে আছে দেখি। আমি ত শালা ভুলেই মেরে দিসলাম—সেই কি নাম রে পেঁচো?

—চন্দ্রাবলী—আমাদের পেঁচো শালার চন্দ্রাবলী। গানটা কী যেন—সখি কী হল কেমনে জানি—মন উড়ু উড়ু হিয়া গুরু গুরু—

ভোদাই সুরটা চাপা গলায়ই সুরু করেছিল। বিকট রব করে শেষ করে ন্যাড়া, মুখেতে না সরে বাণী—ঈ! সখি রে—এ—ফ্। সশব্দে বুকে চাপড়।

পেঁচো অপ্রস্তুত। এক ঝাঁক খিস্তি করে শুধু। বলে, শালারা তবু যদি নিত্যি নিজেরা ঘুর-ঘুর না করতিস! সত্যিই ত—আমার বাঁধা খদ্দের। টান ত থাকবেই।

—শালা মরেছে! তুই দেখে নিস ভোদাই। ও ছোঁড়াকে ছুঁড়ি ফুসলে নিয়ে গেল বলে! আমাদের গোকুল আঁধার করে কোথায় যাবি পেঁচো রে—এ—এ! পাঁচুর গলা জড়িয়ে ডুকরে উঠে ন্যাড়া।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় কানাই। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে আলোচনা একটা মেয়েকে ঘিরে।

পাঁচু ঝুলির সব খিস্তি উজাড় করে দেয় নিজের মনের দুর্বল কোনটুকু রক্ষা করার জন্য। পাঁচু যত রাগে, ওরা তত রাগায় ওকে। যেন খেলা।

ন্যাড়া বলল শেষমেষ, ওদের কথায় তুই কান দিতে যাচ্ছিস কেন—আচ্ছা আহাম্মুক ত। নে বিড়ি ছাড় দেখি এট্টা।

—আর আমরা বুঝি জোয়ারের মড়া রে শালা।

কোন রকমে ওদের মুখ চাপা দেওয়া নিয়ে কথা। এক কথায় পাঁচটা বিড়ি বেরিয়ে গেল—নগদ তু পয়সা! মনটা কষকষ করে। করলে কী হবে!

—তুই একটা কন্দকাটা—বুইলি কানাই! মাথা বলতে তোর কিস্যু নেই। মালটা আমাদের খাটনিটা তোর কি না? ন্যাড়াই বলল।

দমদমায় পাঞ্জাবীর হোটেল। ধোঁয়াটে বাম্বে গা ছমছম অন্ধকার জমে আছে চেয়ার টেবিলের তলায়।

—আঃ থামিয়ে দাও পাঁইজী! লাখটাকার কম কোন শালা কথা বলে না! বিরক্ত ভোদাই। সারাদিনের প্রাণ হাতে করে খাটুনী—এখনই বাসায় ফিরে কী দেখব তার ঠিক নেই। ফটকে ব্যাটা যদি চাল না পৌঁছে দিয়ে থাকে ত হাঁড়ি শিকেয়—এখন কী আর লাখ টাকা কোটি টাকার খবর ভাল লাগে? খবর হচ্ছিল রেডিওয়।

—শালার টাকা যায় কোথায় বল ত?

—পকেটে। থুড়ী, ব্যাঙ্ক। তোমার কাছথে আমার কাছথে কুড়িয়ে সরকারী তবিল সেখান থে—দরকার কী বাওয়া ওসব কথায়। নে হিসেবটা মিটেছে ত। চা খাওবি ত কানাই—গলাটা শুকিয়ে উঠেছে বকতে বকতে।

পয়সা ক আনা হাতে নিয়ে বসেছিল কানাই। বারো আনা! তার রোজগার। সত্যিই সে রোজগার করেছে? বিশ্বাস করতে কেমন যেন ভয় হয়—হয়ত স্বপ্ন দেখছে—এসব কিছুই সত্যি নয় হয়ত। ঘুমটা ভেঙ্গে গেলেই সব ফর্সা। বেমক্কা রোজগার। ধরতে গেলে কুড়িয়ে পাওয়া—তাছাড়া আর কী।

পকেট থেকে তিন ভাগ পয়সা বার করে টেবিলে ঢেলে দিল কানাই—তিন ভাগে। তিনজনের কাছ থেকে মাল নেওয়া। উদগ্রীব

ভোদাইই বেশী। গুণল।

—আরে শালা যে বেশ চালু ভুলো—পয়লা দিনেই প্রায় তিন টাকা ঘাপুচ মাইরী। কৃতী সন্তানের সুখ্যাতিতে মুখর তৃপ্ত পিতা যেন ভোদাই।

পয়সা বারো আনা ভোদাই-ই ওর হাতে তুলে দিল—নে রে পয়লা দিনের কামাই। আর ঐ এগারো আনায় তোর গিয়ে—চার আনাই ধর। ও আর পাচ্ছিস নে—গণেশ পূজোয় লাগা শালা। খোদা-তেরা-ভালা করে—বাবা!

ওর দাড়িটা ধরে নেড়ে দিল একবার।

কানাই বলেছিল, কিন্তু এ বারো আনা আমায় কেন, মাল তোদের আমি ত ব্যবসা শিখছিলাম। শেষের দিকটা গলায় তেমন জোর পায় নি। খুচরো পয়সা বারো আনার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে মুঠো এঁটো ধরেছিল—যেন ফস্কে না যায়!

—কাল ফার্ষ্ট রাণাঘাট লোকালে আসবি—সকাল বেলা। দমদমায় বসে থাকব। আর এক কাজ—থাক, কাল হবে--ন্যাড়া থেমে যায় কেন কে জানে।

—কাজটা কী তাই বল না। কানাই কৌতূহল প্রকাশ করে।

—সে হবে খন। হরলিক্‌স্ এর শিশিটা খালি করে নেয় ন্যাড়া। লজেন্সগুলো নিজের জারে পুরছে দেখে কানাই বলল, ওটা আজ থাকত আমার কাছে।

ভুলো হাসল। চোখে চোখে কা যেন কথাও বলল চারজনে। পরামর্শই হয়ত বা। বলল, হ্যা গো শালা—কোথাকার কে তার নেই ঠিক ওকে মালশুদ্ধু শিশিটা দিয়ে রাখি আর উনি দিন ডুব! ভাগ শালা—কাল পাবি ফের। নিয়ে যদি হটিস ত পেঁচো কী কান্থ কান্থ করে ঐ শিশির জন্যে বিন্দাবন পর্যন্ত ছুটবে?

লজ্জায় পড়ে গেল কানাই। অপমান? কৈ না—ওরা তো বেশ সহজ। এত সহজভাবে আর যাই হোক অপমান করা যায় না।

অপমান করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। সোজা সহজ কথা কিন্তু তবু যেন খচ্ খচ্ করে বাধে কোথায়।

হাসির বেগটা কমে গেল তখুনি। ভোদাই বলল, এত বুদ্ধি তবু বোকা হও কেন চাঁদ! পয়সা কড়ির ব্যাপার। দিনকাল যা পড়েছে বাপকেই ভরষা হয় না, তুই ত কোন শালার পিসেমশাই!

ও প্রসঙ্গের ওখানেই ইতি। আবার হৈ হৈ সকলে।

—তাহলে কাল রাণাঘাট লোকালে দমদমায় নামবি। মালপত্তর আমাদের থেকেই চালিয়ে নেবে—পয়সা বারো আনা যেন পেটায় নমো করে বয়ে থাকিস নে। পাঁচ সাতদিন একটু খেটে কাজ কর—পুঁজিটা করে নে। আমরা তো আর বারোমাস মাল জোগাব না।

—জোগালেই বা। আমি দাম দোব তোরা মালপত্তর এনে দিবি। আমি বেচে খালাস।

—শালা যেন আমার বোনাই রে! এ্যাদ্দিন আমায় ভুলে কোথায় ছিলে প্রাণনাথ। পেঁচো বাঁ হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে সশব্দে ওর মুখে চুমু খেয়ে বসল পথের মধ্যিখানেই। পথচারীদের মধ্যে যাদের চোখে পড়ল—চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেল এক আধজনের। ঘৃণা—নিরূপায় ক্রোধ! ইতরামী। বলবার উপায় নেই কিছু!

পেঁচো আজ বিকাল থেকেই খুব খুশী। অথচ সোদপুরে যখন ওদের মধ্যে পরিচয় ঐ-ই ছিল সবচেয়ে গম্ভীর। মুখ গোমড়া।

ভুলোই যত নষ্টের গোড়া—ইচ্ছে করেই কানাইকে ও বগীতে পাঠিয়েছিল সে-ই। কানাই কাজ করল—নেমে আসতেই ভোলার প্রশ্ন, নিল?

—পাঁচ আনা। সাফল্যের হাসি কানাই এর।

—কা বললি? উৎকণ্ঠা পাঁচুরও কম ছিল না। ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যের বোঝা ঝরে পড়ে পাঁচুর প্রশ্নে। থতমথ খেয়ে যায় কানাই।

—দেখলি ভোদাই—শালা পাঁচ আনা গলিয়েছে। যাঃ পেঁচো

তোর দফা গয়া। ভুলো বেশ খানিকটা উল্লসিত। যা ভাবা গেছে ঠিক তা নয়। অবচেতনার ঈর্ষা পরিতৃপ্ত। বুকথেকে ভারী পাথরখানা নেমে গেল যেন। কিন্তু দুকথায় তখনি বোঝা গেল পাঁচ আনার লজেন্স নিয়েছে বটে তবে পাঁচজনে আর ঐ পাঁচজনের মধ্যে ওদের চিহ্নিত বিশেষ প্যাসেঞ্জারটি নেই।

—দুশ্ শালা অকম্মা! ভুলো যেন বসে পড়ে।

—এবার দেখ্ পাঁচুগোপাল চলল। চটাস করে ভুলোর মাথায় আলতো চড় বসিয়ে পেঁচো একটা হ্যাণ্ডল্ ধরে চলন্ত গাড়ীতেই উঠে পড়ে। আর দেখবার কিছু নেই ভাববারও নেই কিছু। পেঁচোর লজেন্স যেন মিষ্টি বেশী!

কানাই বিশেষ কিছু ভাবতে পারে না—কিছু একটা অনুমান—বিশেষ করে ঐ বর্ষার নলডগার মত চঞ্চল মেয়েটার পাশে পেঁচো, খোঁচা খোঁচা রুক্ষ চুল পেঁচোকে দাঁড় করিয়ে—অসম্ভব। ভাবতে গেলেই পেঁচোর পোষাকের ঘাম তেলচিটে চিমসে গন্ধ ভক্ করে মুখে ঢুকে যায় খানিকটা।

বেশ মেয়েটা। কিন্তু কেন যে বেশ বুঝতে পারে না। অমন কত গণ্ডা মেয়েই ত পথে ঘাটে ট্রেনে দুবেলা দেখছে। শিয়ালদায় সকালের দিকে নিজেদের সীটে বসে থাকলে ঝাঁক ঝাঁক দেখা যায়। ব্যস্ত চঞ্চল তারা আরো বেশী। নোংরা থুথু গয়ার জল কাদা থেকে কাপড় বাঁচিয়ে এক এক ঝলক মিঠে বাতাস বহে যায় যেন তবু ত কাকেও দেখে মনে হয় নি, বেশ!

বেলঘোরেয় যখন বুকে বইখাতা চেপে ধরে ভীড়ের স্পর্শ বাঁচিয়ে গেট পার হয়ে চলে যাচ্ছিল পিছন থেকে এক পলকের দেখা। গাড়ী চলছে জানলার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায়। তাতেই মনে হয়েছে, এমনটি আর দেখি নি। কিন্তু কেন? সদ্য পরিচিত সাথী পেঁচোর বাঁধা খদ্দের বলে, না আর কিছু? তাই হবে বা। চলার পথে বিশেষ ভাবে বিশেষ কাকেও পাওয়া তা সে যতটুকুর জন্যেই

হোক—অনেক বড় প্রাপ্তির চেয়েও দুর্লভ ত বটেই। হয়ত তার চেয়েও কিছু বেশী। কিছু বিচিত্র !

রিক্সাটা প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছিল। এও একপলকের দেখা ! আলো আঁধারীতে তা-ও। তবু—শরত বিশ্বেসের মেয়েই। সঙ্গের মানুষটাও চেনা চেনা প্রায়ই দেখে ষ্টেশনে ঘোরাফেরা করে পাঁচজনের খবর টবর নেয়। সুবিধে অসুবিধের কথা জিগ্যেস করে। বর্ডার শ্লিপের ব্যবসা। বর্ডার শ্লিপ না হলে পুনর্বাসনের ঝামেলা। অনেকের নেই, পয়সা দিতে হয় বই কী। কিন্তু ওর সঙ্গে সুমতি চলল কোথায় ? কোন কাজ কর্মের সন্ধানে ? কিন্তু তা-ই বা এত রাতে কেন ? খানিক আগে পাঞ্জাবীর হোটেলের রেডিওয় আট্টা বেজে গেছে মনে পড়ে গেল কানাই এর। রিক্সাটা যে সুরভি ছড়িয়ে গেল তা কানাই এর মগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে যেন।

ওকী তবে—? রোজই কী যায় ?

অসম্ভব নয় ! কানাই ত আর সন্ধের সময় খোঁজ করে দেখে নি কোন দিন।

একটা সম্ভাবনার কথাই মনে হয় কানাই এর। নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সবকিছুকেই রোজগারের কাজে লাগাতে ওস্তাদ একদল মানুষ। কারখানার ছাটাই মাল আর সমাজের ছাটাই মানুষ—দুই-ই পণ্য।

হয়ত সুমতিও— !

ভাবতে পারে না কানাই। মাথার মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ে কানের পাটা গরম হয়ে ওঠে। চোখ দুটো পিছন দিকে ফিরিয়ে সন্ধান করে —না, অনেক আগেই রিক্সাটা সাউথ সিঁথি রোডের মোড়ে লুকিয়ে পড়েছে ! ভালই হল। কীই বা করত সে ! রাগ হয় সুমতির উপর—কী পেয়েছে সে এতে ? সাড়ী, ইয়ারিং, হয়ত ব্রোঞ্জের ওপর চার গাছা চুড়ী আর—আর কী ? মাত্র এইটুকু ? না কী, আরো কিছু ? হয়ত যে ভবিষ্যত সংশয় আর হতাশার ধোঁয়ায় ভরা তারই

ফাঁক থেকে একটা সন্ধ্যাপ্রদীপের হাতছানি, হয়ত বেলাশেষের ছায়াঘন ঘরের স্বপ্ন যে ঘরে সে-ই রাণী! হয়ত আরো কিছু, অনেককিছু!

নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় কানাই এর।

দোলের দিন--দোলের দিন না ফাগুয়া? হিন্দুস্থানীরাই মাতামাতি করছিল বেশী—ষ্টেশনের কুলীরা, বাইরের ফড়েরা কাঁকনাড়া নৈহাটির দিকের হয়ত। প্লাটফরমেই মাতামাতি বেশী কানাই কোথাও যায় নি, একটা সার্ট একটা কাপড়—তাও জায়গায় জায়গায় ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে, রং মাখামাখি হয়ে গেলে সম্ভাব্য চাকরীদাতার মনে বিতৃষ্ণা জাগতে পারে—বাঁচাতে চেয়েছিল সেজন্যই। একটা ছেঁড়া শাড়ীর আধখানা পরে বসেছিল সে—সীটে নয়, বেঞ্চিটাতে। সারাগায়ে আবার খুনখারাবী আর টিয়ারংয়ের বেহিসাবী ব্যবহার। কে আবার অতি উৎসাহী একজন খানিকটা রূপালী রং লাগিয়ে দিয়ে গেছে দুগালে। রেলের কোন শ্রমিক, হয়ত ক্যারেজ ওয়াগনের। গালটা জ্বালা দিচ্ছিল, তিসির তেলের গন্ধ নাকটা ঝাঁজিয়ে দিচ্ছিল। কি আর করা যাবে! ওরা আর জানবে কী করে যে ওর গায়ে যে রং লাগান হল তার সবটুকুই ব্যথ--এত হৈ হল্লা তার প্রাণে কারো আগমনের সাড়া জাগায় নি, নির্বিকার বসে বসে সে যত আবীর মাথায় মাখলো তার একটা কণিকার রংও ধরে নি তার মনে।

তবে হ্যাঁ, বিস্ময় তার জন্যও অপেক্ষা করছিল চমকেও উঠেছিল সে।

ওমা—কানাইদা যে, কী মূর্তিই হয়েছে, চেনে কার সাধ্যি—

সুমতিই। কথা খুঁজে না পেয়ে হেসেছিল কানাই। কেমন দেখিয়েছিল সে হাসি অথবা আদৌ দেখা গিয়েছিল কিনা কে বলবে!

বিশ্বাস হল না—চল খুড়ীমার কাছে। আমি তাই কত কষ্টে চিনলাম। ওর কাছ ঘেঁসে বসল সুমতি।

হবেও বা। খুড়ীমা অর্থাৎ কানাই এর মা। উড়িষ্যার সম্পর্ক। কিন্তু খুড়ীমার কাছে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না তুজনার কারো। ওর পাশেই বসে পড়ল সুমতি। এরই মধ্যে সে স্নান সেরে নিয়েছে কখন। দেহে আর্দ্র স্নিগ্ধতা। চুলে তেল পড়ে নি। সে অভাব পুরিয়ে নিয়েছে সযত্ন পারিপাট্যে।

সারাদিন কী ভূত সেজেই বসে থাকবে না কী ?

কী একটা নতুন সুর সুমতির কণ্ঠে। উত্তর দিতে পারে নি, বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হাতড়ে ফিরছিল অতীতকে—ময়ূরভঞ্জের এক অখ্যাত গ্রাম উপকণ্ঠের মহুয়া গন্ধভরা পাহাড়ী জঙ্গলের হধ্যে নিজেকে পৌঁছে দিয়েছিল সে। কোন কূল-কিনারা পায় নি। মহুয়ার গন্ধ তার চেনা কিন্তু—

জঙ্গলে ঢুকেছিল কাঠ ভাংতে। স্থানীয় আদিবাসী মেয়ে পুরুষের দলের সঙ্গে—ওরা কোনদিকে গেছে জানে না। ওরা নিজেরা এগুচ্ছিল সুমতি আর কানাই। নির্জন জঙ্গলের আছে সম্মোহন শক্তি। আলেয়া পথ ভোলায়, জঙ্গল নতুন পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় দূরে, আরো দূরে আপন হৃদয়ের গভীরে। কেমন একটা গোঙানীর আওয়াজ—বড় কাছে। থমকে দাঁড়িয়ে ।ড়ল তুজনেই—নিজের অজ্ঞাতসারেই বাঁ হাত দিয়ে সুমতিকে আরো কাছে টেনে নিল কানাই। একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে আড়াল করতে চাইল। হাতের সড়কী আর টাঙ্গিটা বাগিয়ে ধরে শব্দটা লক্ষ্য করে এগুচ্ছিল সে—এগুচ্ছিল শব্দটা কিসের জেনে নিশ্চিন্ত হতে। এতকাছে শব্দটা যে ফেরবার উপায় নেই—বাঘ ভল্লুক নয়, ঠিক যে কী তাও বুঝতে পারছিল না। পায়ের শব্দ নেই তুজনেরই, যদি বা কোন শুকনো পাতায় পা পড়ে খস খস শব্দ হচ্ছিল চমকে থেমে যাচ্ছিল তুজনেই। হঠাৎ ওর ডান কাঁধটা চেপে ধরে সুমতি কাছে টেনে নিল ওকে। চমকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুমতির দিকে তাকাল। তার উৎফুল্ল বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা হরিণী শুয়ে। তখনই

অসহ্য যন্ত্রণায় হাতপা ছুড়ে কাতরে উঠল একবার। পাশদিয়ে বড়মত গিরগিটি ছুটে যেতেই একবার উঠে পড়তে গিয়েও পারল না—আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ল তখনই।

সুমতি ওর হাতের উদ্যত সড়কিটা চেপে ধরতে বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল কানাই। এমন শিকার—এখনই হয়ত একছুটে কোন জঙ্গলে ঢুকে যাবে। সুমতির চোখের দিকে তাকাতেই দেখল দুচোখে তার উৎকণ্ঠা। ওকে ধীরে ধীরে পিছনে টেনে নিয়ে এল আর খানিকটা।

কী হল বল ত তোর? জিজ্ঞাসা করল কানাই।

তুমি বোস—আমি আসছি এখনই। খবর্দার এসো না এদিকে।

ওর আঁচল চেপে ধরল কানাই। বিরক্তি তার মুখে চোখে।

ব্যাপার কী খুলে বলবি না কী? চ আমিও যাব—একা যায় না—বুনোজানোয়ার।

না বোস লক্ষ্মীটি—এখন তোমার ওখানে যেতে নেই।

আচ্ছা আপদ যাহোক! ভেবেছিল কানাই।

বলেছিল, যেতে নেই ওখেনে—কেন? বিস্মিত হয়েছিল খুবই।

সুমতি নির্বিকার। বলল, বাচ্চা দিচ্ছে যে হরিণটা।

আর জোর করতে পারে নি কানাই। কিন্তু বুঝতে পারে নি সুমতি যাচ্ছে কেন। বুনো জানোয়ার দরকার কী ওর কাছে যাবার। যত্ত সব!

তবে তুই যাচ্ছিস কেন—চ ফিরে যাই!

বোস না একটু—এ অবস্থায় কী একা ফেলে যেতে আছে!

কোন শাস্ত্রে যে এ নির্দেশ আছে জানে না কানাই—প্রতিবাদও করতে পারে নি। যদিও উদ্ভট মনে হয়েছে। জঙ্গলে বছর বছর অমন কত হরিণেরই বাচ্চা হচ্ছে। আফশোষ হচ্ছিল তার অমন শিকার হাতছাড়া হওয়ায়?

গাঁয়ে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল সেদিন। একদল লোক তখন কয়েকটা মশাল সড়কী বল্লম আর টাঙ্গি নিয়ে ওদের খুঁজতে বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

পথে আসতে আসতে ঠিক এমনই মৃদু চমৎকার গন্ধ পেয়েছিল কানাই। বিকালে ঝাপসা আলোয় বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল সুমতিকে। সারাপথ সে যেন কোন সুখচিন্তায় ডুবে ছিল।

চমৎকার বাচ্চাটা না? একবার জিজ্ঞেসও করেছিল।

হুঁ। কী-ই বা উত্তর দেবে কানাই। সে তখন যেন নতুন কোন অনুভূতির রাজ্যে। চমৎকার কিছুর আভাষ তাকে সম্মোহিত করেছে। সে যেন নিজের মাঝে কী খুঁজছে—কাঁটা পাথর ভেঙ্গে সুমতির পাশে পাশে চলতে বড় ভাল লাগছিল। বাড়ী ফিরতেই মা যখন ব্যগ্রভাবে ছেলের মুখে কী অনুসন্ধান করে, কী ভেবে জিগ্যেস করল, এত দেরী—আছিলি কই?

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিছু না ভেবেই উত্তর দিছল কানাই। কেন যেন তার মনে হয়েছিল সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে না। কিন্তু খানিকপরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে ঘরের দাওয়ায় বসে গুনগুন করে গান ধরে টেমির আলোয় বসে জাল বুনতে বুনতে মনে হল কথাটা—সুমতি যদি অন্য কিছু বলে থাকে বাড়ীতে!

হাতের খুরচি থেমে গিছল তার। বলে বলুক না কী হয়েছে তাতে? মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলেও বোঝাতে পারে নি। সারা দিন জঙ্গলে কাটিয়ে এসে—ছি ছি কত কী-ই ভাবছে সবাই। তার উপর আবার সুমতি যদি বাহাদুরী করে—

বুকটা সুখকর দুর্ভাবনায় ভরে গিছল তার। সে যেন তখনো সেই গন্ধটা পাচ্ছে। সারারাত অনেক চেষ্টা করেও সুমতির উপর বিরূপ হতে পারে নি সে। যতই মন থেকে ওর কথা ঝেড়ে ফেলে দিতে গিছল ততই যেন বেশী করে কেবল সুমতির সেই ফিসফিস

স্বরে কথাকটা কানে এসে বাজছিল, বোস লক্ষ্মীটি—এখন ওখানে তোমার যেতে নেই! তারপর, বাচ্চা দিচ্ছে যে হরিণটা।

সৃষ্টির আদিমতম বিস্ময় যেন—সৃষ্টির মৌলিক শ্রদ্ধামাখা ছিল সুমতির স্বর। বড় মিষ্টি। কেমন যেন মধুর লেগেছিল কানাইএর। অনাস্বাদিতপূর্ব!

সুমতিও ঐ একই কথা বলেছিল তার বাড়ীতে। হারিয়ে গিছলাম

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল কানাই। অবশ্য খুব খারাপ লেগেছিল যেদিন জানতে পারল জঙ্গলে কাঠ আনতে যাওয়া সেদিন থেকে সুমতির বন্ধ হয়ে গেছে।

আজ কানাইএর বড় ভয় লাগে। বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। ঠিক তেমনিই সন্ধ্যা—যদিও কমদামী গন্ধদ্রব্যের নাক ঝাঁঝাঁনো গন্ধ হকচকিয়ে দিয়েছিল, তবু চিনতে ভুল হয়নি কানাইএর। বরং এই-ই প্রথম চিনল বলা চলে। চিনল সুমতিকে, চিনল নারীকে আর নারীদেহের সুরভিকে। শিয়ালদা স্টেশনের বেঞ্চে, উড়িষ্যার জঙ্গলে আর দমদমায়—শেষেরটা এক ঝলকের তবু স্পষ্ট। প্রত্যেক মেয়েরই বোধহয় আলাদা আলাদা অভিজ্ঞান আছে। আর তা নিশ্চয় নিত্য মনোরম। কেন যেন কথাটা মনে হয় কানাইএর। বহুদিনের একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান এ ভাবেই করে নেয় কানাই।—কিন্তু গেল কোথায় সুমতি? ওভার ব্রিজের ওপর গিয়ে চুপ করে বসল কানাই। কেন যেন ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শিয়ালদায় তার কেউ নেই কিছু নেই। এইমাত্র যেন সুমতিকে ঘনবনে হারিয়ে ফেলল সে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। চারিদিকে লোক যাতায়াত না করলে হয়ত কাঁদতও সে। একবার মনেও হল না তার উড়িষ্যা থেকে ফিরে শিয়ালদায় পৌঁছেছে তিনবছর হতে চলল এর মধ্যে তিন কি চারবারের বেশী কথাই কয়নি সুমতির সঙ্গে। একটা সান্নিধ্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল উড়িষ্যায়—সে ঘর ভেঙ্গে

শিয়ালদায় এসেছে ওরা —সে সম্পর্কের কাঁচা বাঁধন ফেলে নূতন করে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তৈরী হয়ে বসে রয়েছে তারা যেন। যে কোন সময় ডাক আসবে, সাড়া দিয়ে পিছনে না ফিরে গিয়ে উঠতে হবে ট্রাকে !

কেন যেন কানাই এর—কেবলই মনে হতে লাগল—জীবনের আর বুঝি কোন উদ্দেশ্য নেই। বেঁচে থাকা না থাকা দুই-ই সমান। এই মাত্র যেন তার সারাজীবনের সঞ্চয় চুরী হয়ে গেল ! চুরীর কথা মনে হতেই আপন অজ্ঞাতে পকেটে হাত চলে গেল। অনুভব করে গুনল—ঠিক আছে, পুরো তেরো আনা কয়েকটা বিড়ির সঙ্গে জড়াজড়ি করে পকেটে পড়ে আছে। পয়সার কথা ভুলেই গিছল সে। ভাগ্যিস ! পয়সা কআনা চেপে ধরল পকেটের মধ্যেই। এখনই যে গাড়ী পাওয়া যাবে তাতেই ফিরবে শিয়ালদায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলে মনে মনে ধিক্কার দেয় নিজেকে ; কপাল ভাল তাই এখনো রয়েছে—দমদমার গাঁটকাটা, ডাকসাইটে গাঁটকাটা !

বনগাঁ লোকাল আসছে। ঐটেই ধরতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এল কানাই। একহাতে পাশপকেটটা চাপা ! পকেটে পয়সা নিয়ে দমদমায় দাঁড়িয়ে যত রাজ্যের আবোল তাবোল চিন্তা ! নাঃ ! নিজেকেই পাঁচকথা শুনিয়ে দেয় কানাই। নিজেরই দুগাল চড়ায় মনে মনে।

মৌতাতের সময় এসে গেলে মদখোর যেমন শুঁড়িখানার দিকে সব ভুলে এগিয়ে চলে—সারা পৃথিবীটাই তেম্নি করে চলেছে যেন। পয়সা। পয়সার নেশা—শুধু নেশা নয়। একজনের কাছে যা নেশা অন্যজনের কাছে তাই-ই জীবন রক্ষার মহামন্ত্র। দাঁড়িপাল্লার একদিকে ভোগ্যের পাহাড় অপরদিকে বৈধব্যের রিক্ততা নিঃস্বতার ভ্রূকুটি। এই ভ্রূকুটির

মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষ প্যাঁয়তাড়া ভাঁজছে। হার মানবে না সে। মনুষ্যত্ব কখনো হার মানবে না!

কানাইও হার মানবে না। সেও একবার এই নির্দয় সুন্দর পৃথিবীর দৌড়টা দেখে নেবে। সূতা ছাড়ছে সে ত সময় এলেই গুটাবার জন্য প্রস্তুত হবেই। বুকের পাটা বেড়ে গেছে তার।

লজেন্স। তারপর ঐ থেকে দুচার পয়সা জমিয়ে ছোট দোকান দেবে একখানা—মালক্ষ্মী যদি মন করে কপাল ফিরতে কদিন! কথায় বলে মানুষে দিলে কুলোয় না দেবতা দিলে ফুরোয় না।

পাঁচসিকে দেড়টাকা নিত্যি আয় তার। একটা বরে টাকা বাপের হাতে তুলে দেয়। চালকেনার ভাবনাটা কমেছে খানিকটা। আর কিছুদিন এভাবে যদি টেনে যাওয়া যায় হয়ত মাথা গোঁজবার একটা ব্যবস্থাও যাহোক করে করে নেওয়া যাবে। টাকা চাই—আরও টাকা। ভোরবেলা সে কাজ সুরু করে দুপুরে একসময় এসে খেয়ে যায় আবার সেই রাত দশটা অব্দি। মাঝে সময় পেলে দু এক কাপ চা। সারাক্ষণ গাড়ীতে, আপ থেকে ডাউন আবার আপে—কখনো বনগাঁ কখনো ডানকুনী আবার কখনো মেন লাইনে। লজেন্স বেচতে বেচতে মাঝে মাঝে রাণাঘাট পর্য্যন্তও চলে যায়—চলে যায় বনগাঁ। কোনদিন দুপুর হয় রাণাঘাট বনগাঁ লাইনের কোন ষ্টেশনে হয়ত। ভাত খাওয়া হয় না সেদিন। অবসর নেই—অবসর খোঁজবার প্রয়োজনও বোধ করে না। খাটলেই পয়সা—না খাটলেই উপোষ। দেহটা ক্লান্ত হয়, মন তার নাকে দড়ি দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে।

নিত্যি কানভ্যাসার বাড়ছে—রোজই দুচারটে নতুন মুখ। আরও বাড়বে। বাড়বে না শুধু আয়। আয় কমার মুখে। বাড়াবার কোন উপায় নেই।

লজেন্স ছেড়ে পাঁউরুটি ধরল কানাই। ঠিক তিনদিন—তিনচার টাকা লাভ রোজ। আবার বাজার ঢ্যাবঢেবে—ওর দেখাদেখি অনেকে পাঁউরুটি সুরু করেছে। আয় কমল। বারো আনা একটাকা

রোজগার করতেই হাড় হিম। তাছাড়া মুস্কিলও কম নয়—লজেন্স একদিনে সব বিক্রি না হলে ক্ষতি নেই এমন কিছু—পরের দিন চালান যায় কিন্তু পাঁউরুটির বেলায় সেটি হবার জো নেই। বাসীরুটি কাউকে দিলে ঠ্যাঙ্গানি খেতে হবে! কি মারটাই খেল সেদিন বক্কেশ্বর—চানাচুরের প্যাকেটে আরশুলার ঠ্যাং। ওর কথা শুনলই না কেউ। ও যত বলে, কোম্পানী দিয়েছে আমি কী করব। তত মার।

যত দিন যায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে কানাইয়ের। নিত্য নূতন ঝামেলা। আজ মোবাইল কোর্ট, কাল হরতাল পরশু কোথায় রিফ্যুজিরা লাইনে শুয়ে রেল বন্ধ করে দাবী পেশ করছে কোন বধির কানে—মরণ ক্যানভাসারদের! কানাই ভাবে আয় ত টাকা পাঁচ সিকে তাও যদি অর্ধেকদিন বন্ধ থাকে ত চলে কী ভাবে? তার ওপর যদি কোনদিন ধরা পড়ে জেলেই যেতে হয় ত একেবারে ঠাণ্ডা।

আন্দামানের ডাক হচ্ছে গেলেই ভাল হত। সাহসে কুলায় নি। একবার ঠেকেছে উড়িষ্যায় গিয়ে আর নয়—বাংলা ছেড়ে আর নয়। তবু একদিন দীনবন্ধুকে বলেছিল কানাই। কী বাবা, নাম দেবেন না কী আন্দামানে?

কস্ কী! খুন করা৮? আন্ধারমান যামু কোন ঠ্যাহায়? ফিরুম্—পাকিস্তানেই ফিরুম্, হে দিনের আর বিলোম্ব নেই বড়।

তুই নিকতে জানস কানাই—তুই হেডা কী কলি ক ত। দেখচস মানুষডার মাতার ঠিক নাই—অরে জিগাস আন্ধারমানের কতা? মনের খেয়ালে অপিসে নাম লিকিয়ে এলে তহন? তরা যাস আমি লিচ্চয় চাকায় মাতা দিতাম কলাম। আন্ধারমান—হালদার গো বিটি কতিল হে কালা পানি জলে আঁশ নাই—জাহাজ জলের তল দে যায়। মাজ নদীতে মাচের লাখান কী এট্টা জানোয়ার আচে কবে কেডা হে জাহাজ আটকায়। এট্টা মানুষ পূজো না দিলি জাহাজ ছাড়ে না—মানুষ যায় আন্ধারমানে! ছ্যাশে ফিরুম—তাই চ ক্যানে।

দীনবন্ধু কোথায় গিছল। সারদা সুযোগ খুঁজছিল। মনের কথা বলে নেয় ছেলেকে। মাথা কুটতে ইচ্ছে করে তার। দুটো দুরকম। যেমন বাপ তার বেটা কী আর অন্যরকম হবে। আক্কেল কাণ্ড নেই দুটোর এট্টারও! সারদা কতদিক সামলাতে পারে?

সোদপুরের লেভেল ক্রসিংএর সেই দোকানটায় বসে পর পর দুকাপ চা খেল কানাই। দুপুরে সকালে বিক্রী হয় না তেমন। বিকেলে বাজার ভাল যায়। সে সময়েই যা বিক্রী। তার ওপর দমদমায় চারজন ক্যানভাসারকে ধরে নিয়ে গেছে রেলপুলিশ। বিনা লাইসেন্সে গাড়ীতে ফেরী করা বে আইনী কাজ। আজকের হিসাব চুকেই গেছে। সন্ধ্যা ছটার আগে আর লাইনে বেরুনো যাবে না। আতংকের ছায়া নেমে আসে মুখে। চিন্তা যত জটিল হয় বিড়িও খরচ হয় তত ঘন ঘন। চোখ দুটো নিষ্প্রভ।

আগুণ ছুটছে হাওয়ায় যেন। এক আকাশ আগুণ। রুটি তৈরীর তাওয়ার মত তেতে আছে। পথের ধূলোয় মাটি নেই। ছাই—সব আশাভরষা সব কামনার গৈরিক বর্ণ ভস্ম!

সন্ধ্যার গাড়ীটা ধরে ফিরছিল সে। বিমর্ষ অন্ধকার নেমে এসেছে মাঠে। আবছা মলিন আবরণ মুড়ি দিয়ে ধূসর পৃথিবী হাঁপাচ্ছে যেন। গাড়ীর মধ্যে আলোর চারপাশে কয়েকটা সবুজ পোকা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথা কুটছে কাচের ঢাকনীতে। লাইনের ধারে সারবন্দী ঝিঁঝিঁ ডাক—প্রতিমুহূর্তে চলচ্চিত্রের মত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ডেকে চলেছে। যেন ঘরের পিছনে বসে ডাকছে। স্পষ্ট শোনা যায়। ইঞ্জিন অনেক দূরে—মাঝে মাঝে হুইস্‌ল ছাড়া আর তার গর্জনের একটুও শোনা যায় না এত পিছন থেকে। ডান হাতের আকাশে রাতের জঙ্গলে আগুন লাগার ঔজ্জ্বল্য। রক্তাক্ত। শহর সেজেছে দূরে। লাইনের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে আলোকমালা। বাঁহাতি মাঠের মধ্যে জোনাকীর দল যেন লণ্ঠন হাতে কোন হারানো প্রিয়জনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। শহরতলীর নিশাচরী কারখানার জীবন সুরু

হয়েছে—বয়লারের ধোঁয়া স্তরে স্তরে সিঁড়ি ভেঙ্গে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন—আসছে যাচ্ছে—পিছনে ফেলে যাচ্ছে একমিনিটের হৈহুল্লোড় চেঁচামেচি আলোর ছিঁচকাঁতুনী তারপর সব একাকার। গাড়ী ছুটছে পাথর কাঁপিয়ে। রেলের জোড়ে জোড়ে আঘাতের আর্তনাদ তুলে গাড়ী ছুটছে। কাঁচা কয়লা পোড়া ধোঁয়ায় বাতাস ঝাঁঝাঁল।

বিক্রী মাত্র একটাকা। খরচা বসেছে সাত আনা! কদিনই চলছে এভাবে। অনন্যোপায়! অন্য কিছু করবারও নেই। সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রম!

আজ দীনবন্ধুকে কিছু দিতে পারবে না ও। পর পর তিনদিন আজ নিয়ে। টাকা দিতে না পারায় আগেরদিন দীনবন্ধুর চোখ ছটো কুঁচকে ছোট হয়ে যেতে দেখেছিল কানাই। হাজারো ব্যয়ের ফিরিস্তি দিছল খেতে বসে! হাতে তার এক কপর্দ্দকও আর নেই বার বার শুনিয়েছিল কানাইকে। এবার সব উপোষ! চাল নেই একমুঠোও—মাও সমর্থন করেছিল এখবর। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই এদিক-ওদিক যেতেই কানাই কাঠের চায়ের-বাক্সটার ঢাকনা সরিয়ে দেখে নিছল একফাঁকে—অন্ততঃ দশসের চাল রয়েছে তখনও। কে যেন প্রচণ্ড থাবড়া মারল তার মুখে। ঢাকনাটা আগের মত বন্ধ করে চারি দিকটা দেখে নিল একবার—বাবা মা কেউ দেখল কী না, কেউ নেই কোথাও।

ছেঁড়া চটটা টেনে নিয়ে তার উপর বসে পড়ল কানাই। বাবা মিথ্যা কথা বলল—সব খবর পুরুষ মানুষের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু মা—মাও মিথ্যা বলল! দুদিন পয়সা দিতে পারে নি—ওরা কী মনে করে কানাই ইচ্ছা করে দিচ্ছে না! এত অবিশ্বাস করে তাকে? ওরা কী দেখছে না কী প্রাণপাত পরিশ্রম করছে সে সবার মুখে দু-গ্রাস ভাত তুলে দেবার জন্যে?

কোন সমাধানই খুঁজে পায় নি কানাই। আজ সারাদিন কাজের

ফাঁকে ফাঁকে কেবলই ঐ কথা মনে হয়েছে আর বিষ পিঁপড়ার কামড়ের মত বিষিয়েছে সারা শরীর। যতবার মনে হয়েছে হয়ত তার বাপ-মা এখন তার সততাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে—চেষ্টা করছে ওর কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব বেশী শুষে নিতে—ততই কষ্ট বেড়েছে। খড়দা ষ্টেশনে বসে একখানা গাড়ীই ফেল করল সে—কাজ করতে ইচ্ছাই হচ্ছিল না।

আর নয়—ঢের হয়েছে—এবার যেদিকে ছ্চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবে। এভাবে দিন কাটানো যায় না। আর লাভই বা কী? দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই সে করতে পারে কিন্তু আর্থিক অনটনে যে মানসিক নিঃস্বতা তাকে সে দেউলিয়া করবে কী দিয়ে?

ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথার মধ্যে জটিল গ্রন্থিগুলো সব আলগা হয়ে আসে। জানালায় মাথা দিয়ে তন্দ্রার আমেজটুকু উপভোগ করে সে। কোন সময় ঘুমিয়েও পড়ে—ঘুমটা কেটে যায় গাড়ীটা দমদমায় ঢুকতেই। কী হবে এখনই ফিরে। দমদমায় নেমে পড়ে।

দমদমা মানেই পাঞ্জাবীর হোটেল—ছ্ একজন সাথী সব সময়েই থাকে সেখানে। কিন্তু আজ কোন সাথীতে প্রয়োজন নেই কানাই এর—একলা থাকতে চায় সে। চায় বটে, তবু আপন অজ্ঞাতেই কখন গিয়ে ভোলা নেড়া আর ভোদাইএর মাঝখানে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে পড়ে। যাক ওদের ঘাড় ভেঙ্গে আজ চা-টা হবেখন হয়ত—ভাবেও একবার। মুহূর্ত মধ্যে নিজের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা যে মনে হয় না তাও নয়। ইতিমধ্যে সাতআনা খরচ করা হয়ে গেছে সেটাও ভুল হয় না। মেরে ফেললেও আজ আর একটা পয়সাও খরচ করতে পারবে না সে।

তোর যে আর পাত্তাই মেলে না রে কানাই—দিন কিনে নিইছিস—না? ভোদাই অভিমান ক্ষুব্ধ। কানাইয়ের মনে এই সামান্য কথায় জটিল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অভিমান হয় তারও। ভোদাই এ কথা বলল। এটুকু ভেবে দেখলে না দেখা করে কখন?

শুনি সব—দেখা মেলে না এই যা   বলে ভোলা—যাক বাজার কেমন বুঝছিস বল। এখন মান অভিমানের সময় নয় বোঝে ভোলা।

তিনদিনে তিনটি পয়সাও ঘরে যায় নি। বলল কানাই। সহজ হতে গিয়েও হতে পারল না। স্বর যেন কেমন ভারী—নৈরাশ্যভরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সবারই ত এক উত্তর।

কি দোব? দোকানের বাঙ্গালী ওয়েটার ছোকরা ময়লা ইজেরে হাত মুছতে মুছতে দাঁড়াল এসে। পরস্পরের মুখের দিকে মুহূর্ত মধ্যে দেখে নিল ওরা। দৃষ্টিটা এ্যারোড্রোমের সার্চ্চলাইটের মত ঘুরে এল যেন। কানাই-ই বলল চারটে চা।

চা-টা কী কানাই খাওয়াচ্ছিস নাকি? ভোদাই বলল।

পয়সা কড়ি কিছু নেই, অন্য একদিন হবে। বলল কানাই।

সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। কে দেবে এই চার আনা পয়সা? অসম্ভব—চার আনা পয়সা খরচ করে সঙ্গীদের চা খাওয়াবার মত বড়লোক নয় ওরা কেউই! চার আনা পয়সা—! চারটে বিড়ি বের করাও সহজ নয় আজ। চার আনা পয়সা ত চারঘড়া মোহরের সমান—তার চেয়েও বেশী হয়ত।

শুধু শুধু এরা ত টেবিল কব্জা করে বসে থাকতে দেবে না। সবাই চুপচাপ বসে রইছিস দেখে বলে দিলাম। যে যার নিজের দামটা দিয়ে দিলেই চুকে যাবে'খন.

আমি দামও দোব না—চাও খাব না। বলল নেড়া। চা এসে গেছে ততক্ষণে।

ঠিক আছে—ওটা আমরা ভাগ করে নিচ্ছি। বলল ভোলা। ন্যাড়া ইতিমধ্যে গেলাসটা ধরেছে হাত দিয়ে।

কি বললি—শালা ভুনিয়াটাই বেইমান। হিসাব কর দিনি এ পর্য্যন্ত এ শর্ম্মার কত খেইছিস। নেড়ার স্বর চড়ে যায়।

ভ্যাখ ভাল হবে না বলছি ন্যাড়া—যা তা বলবি নে—খাইয়েছিস যেমন খেইছিসও। ওসব প্যাঁইজী রাখ!

তোরা কী ভেবেছিস চারটে পয়সা খরচ করবার শক্তি নেই আমার—অতটা দম্ভ ভাল নয় ভোদাই। ন্যাড়ার স্বর ভারী।

হ্যাঁ হ্যাঁ—মুরোদ জানা আছে। পয়সা ফেলে গেলাসে হাত দিবি ন্যাড়া—নয়ত এ্যায়সা—

কা কী বললি? সবাই কা তোর মত—বড় পয়সার মানুষ হইছিস কা বল। এই ত্যাখ—পয়সা আমারও আছে!

ন্যাড়া সার্টের পাশ পকেট বাঁহাতদিয়ে কাত করে সব পয়সা গুলো ডানহাতে বের করে আনে। কিছু খুচরা পয়সা—সশব্দে তালু চাপা দিয়ে ফেলে টেবিলে।

ঝোঁকের মাথায় বলে বসে। এই—বিস্কুট দেও দোঠো!

চুপ করে যায় সবাই। মাঝে মাঝে শুধু অবোধ্য স্বরে গজগজ করে ন্যাড়া—বিস্কুট চিবোয় আর গজ গজ করে। শুকনো বিস্কুট ভিজবার মত লালার অভাবে মুখে চা ঢেলে দিয়ে বাকা বিস্কুটখানা চায়ে ভিজোয়। তোলবার সময় মাঝখান থেকে ভেঙ্গে পড়ে যায় চায়ের কাপে, ভাসতে থাকে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে চা শেষ হয়ে যেতেও যখন সেটুকু মুখে আসে না মাথাটা পিছনে হেলিয়ে গেলাসটা মুখে উপুড় করে ধরতেই মুখে এসে পড়ে বিস্কুটটা। তারপর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে পাঞ্জাবীকে একটা দোয়ানী দিয়ে রাস্তায় নামে গিয়ে।

শালার ডাঁট দেখলি? ভোলাই কথা বলল প্রথম।

থাম থাম—অমন ঢের দেখিছি। বড় পয়সার গরম দেখিয়ে গেল! তবু যদি হাঁড়ির খবর না জানতাম। ভোদাই বিষ ঢালে কথায়।

কী রকম? রহস্যের গন্ধ পায় ভোলা। ভোদাইকে খুঁচিয়ে কিছু হাতিয়ার জোগাড় করতে চায়—কোনদিন কাজে লাগে কে জানে। তাছাড়া ন্যাড়ার সঙ্গে তুলনা করে হয়ত নিজের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে এই সুযোগে।

গুষ্টিশুদ্ধু রোজগার করলে আমিও অমন গরম দেখাতাম—শালা

যদি সবার দামটা দিয়ে দিত কী দুখানার জায়গায় চারজনের জন্যে আটখানা বিস্কুটের অর্ডার দিত হ্যাঁ বুঝতাম বাপের ব্যাটা! নিজে খেয়ে অমন বড়মানষী—সব শালায় পারে। সেই কথায় বলে না—রাজাধন বিলোন—কোথায়? না—অন্তপ্পুরে। কুড়োয় কে? না রাণীমা। সারাদিনে দু আনা পয়সা রোজগার হয়েছে কীনা ঠিক নেই—এক কথায় দু আনা উড়িয়ে দিল। ও পয়সা আসে কোত্থেকে তা আর ভোঁদারামের জানতে বাকী নেই! অমন রোজগেরে বোন থাকলে—চপ কাটলেট খেতাম। শালা বোনের পয়সায় বড় মানষী! ভোদাই ফেটে পড়ে দুঃখে অপমানে। নিজেকেই দংশন করে চলে যেন সে।

ওর বোন কী চাকরী বাকরী করে না কী? কানাই জিগ্যেস করে।

চাকরী বই কী—বড় চেকরে! বিদ্রূপতীক্ষ্ণ স্বর ভোদাই এর। আবার আরম্ভ করে সে, নারকোলডাঙ্গার সেডে কয়লা কুড়োয়।

কয়লা কুড়োয়? ভোলার বিস্ময়।

লোকে দেখে কয়লা কুড়োয়—কী যে কুড়োয় আমি জানি। আমার চোখকে ফাঁকী দেবে বাবা—ও অঞ্চলের একটা রেলপুলিশও বাদ দেয় নি বোধ হয়। লোকে বললে হোত বড়মানষীই যখন করচিস্ গিনি জোগাড় কর ভাগনের মুখ দেখবিত—কোনদিন ভ্যাঁকরে বেরিয়েই মামা বলে ডাকবে! নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে ভোদাই। সে হাসিতে বেদনা ঝরে পড়ে—কাঁদতে পারলেই যেন শান্তি পেত সে। নিজের নিষ্ঠুরতায় নিজেই ছটফট করে সে। ওরা গুম হয়ে বসে তখনও।

চ—ওঠা যাক। কানাইয়ের ভাল লাগছিল না এ নীরবতা। বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল। ন্যাড়াটা যাচ্ছে তাই একটা!

ওরা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুলো।

পেঁচোকে দেখছি না কদিন—খবর কী তার। কানাই জিগ্যেস করে।

সে আরেক শালা ফোর-টোয়েন্টি। মামা না বোনাই কে ছিল—মেটেবুরুজে এক কারখানায় কাকে ধরে ঢুকে পড়েছে। শালাদের কুটুম্বুও জুটে যায়! আক্ষেপ ভোলার কণ্ঠে। কম হিংস্র নয় সে-দেড় টাকা রোজ—বলে সে তখনও—ওভারটাইমও আছে শুনলাম। বাসা তুলে মেটেবুরুজেই চলে গেছে।

ভোদাইয়ের সঙ্গে কানাইও দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

যাক শালা বেঁচে গেল!

বাঁচতে হবে না—যাবে কোথায়—আবার এসে এই চাই চানাচুর নকলদানা করতে হবে—এই একটা কথা বলে দিলাম দেখিস। ভোদাই ভবিষ্যৎবানী করে। আশ্বস্ত করে নিজেকেই যেন।

সব জায়গায় ছাঁটাই হচ্ছে—ও বেঁচে যাবে ভাবছিস? অত সোজা নয়—তখন এ শম্মার কথা মনে করিস।

ভোদাই নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে টোকা মেরে 'শর্ম্মাটি'কে চিনিয়েই দেয় হয়ত। শেষ পর্যন্ত ভোলা বলে, ওসব মামা বোনাই ছেড়ে দে—ভেতরে অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমার পিসেমশাই কম চেষ্টা করল আমার জন্যে—বলতে গেলে পিসেমশাই ছোট সাহেবের ডান হাত। ছোট সাহেব আশা দিয়েছে অবশ্য—মার্চ মাসে মনে করিয়ে দিতে বলেছে কিন্তু এখনই ত হতে পারত। হল না। কেন যোগ্যতা কি আমার পেঁচোর চেয়ে কম কিছু? আমি তবু ম্যাট্রিক দিসলাম কেবল সাত নম্বর; এগ্রিগেট এ সাত নম্বরের জন্যে ফেল—এ্যাডমিট কার্ড মার্কসীট আছে দস্তুর মত! ও ত বলে নাইন—হাতের লেখা দেখলে ত মা সরস্বতী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবেন। শালা চারশ বিশ!

ভোলা যেন ওদের সবায়ের কথাই বলে দিল। মনে মনে হিসাব করে দেখল কানাই—সেও নাইন অব্দি পড়েছে। নিজের কাছে ত আর মিথ্যা বলছে না সে—উপরন্তু সব মাষ্টারই বলত এক চান্সে ম্যাট্রিক পাশ করবার ছেলে সে। পেঁচো খুঁটির জোরে

চাকরী পেতে পারে তা বলে একটা বিরাট কেউকেটা হয়ে পড়ে নি। রোজ দেড় টাকা—মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলে অমন কত দেড় টাকা এই ক্যানভ্যাসারী করে রোজগার করা যায় রোজ! মা লক্ষ্মিই বা কেন, আজ সব ক্যানভ্যাসারগুলোর যদি চাকরী হয়ে যায়—কানাই তখন একলা—জুতো মেরে রোজ খরচখরচা বাদে দশ টাকা তবিলে তুলবে না সে! আবার ভাবে—দেড় টাকা রোজ, মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। ওবারটাইম আছে—গড়পড়তায় মাসে পাঁচ টাকা হলেও, পঞ্চাশ টাকা—হেসে খেলে দিন কেটে যায়! মাসে পঁচিশ টাকা তাও ত পাচ্ছে না সে এখন! চেষ্টারও ত ত্রুটি করল না সে—সবই বরাত! এ শালার তুনিয়ার ধাতটাই এরকম—যার নেই তার মোটেও নেই—যার আছে তার সীমে পরিসীমে নেই! ভগবান ব্যাটাও একচোখো! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কানাইএর বুক থেকে। হঠাৎ তার মনে হয় নৈহাটি লোকালের সেই মেয়েটার কথা—পেঁচোর ত চাকরী হয়ে গেল এবার বুনডিকে লজেন্স জোগাবে কে? হাসি পায় তার কথা মনে করে। পেঁচো ছাড়া আর কারো লজেন্স নেয় না সে—এবার? খদ্দেরটা ধরতে পারলে কোনরকমে—হোক চার পয়সার খদ্দের তবু নিয়ম করা বাঁধা খদ্দের ত—কদরই আলাদা। তুনিয়া রসাতলে গেলেও বাঁধা খদ্দেরের পয়সা তবিলে আসবেই আসবে। খদ্দেরটা ধরতেই হবে যে ভাবে হোক।

কলকাতাগামী একখানা চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়ে কানাই, অভ্যস্ত দক্ষতায়।

তামাকটা ধরে উঠেছে। মৌজ করে টানছিল দীনবন্ধু। টানছিল আর ভাবছিল। সারা প্লাটফর্মটা কড়া তামাকের গুড়পোড়া গন্ধে ভরা।

কয়েক ফোঁটা গরম তেলে গোটা চারেক কাঁচা লংকা ভেঙ্গে দিল সারদা। বার দুই নাড়ল খুন্তী দিয়ে। পটপট করে বীজ ফাটছে। উগ্র নাক জ্বালান ঝাঁঝ। পাশের সিদ্ধ ডালটা কড়ায় ঢেলে দিতেই প্রচণ্ড শব্দে ফুটে উঠল সেটা। মেঘনার বাঁকে ঘুর্ণি যেন। দেখছিল দীনবন্ধু। সেখানে তিন কানি জমি আছে তার! গরমেণ্ট যদি কেড়ে না নেয়—এমদাদ মিয়া তার এক চুলও নষ্ট হতে দেবে না। তবে হ্যাঁ যদি মেঘনা রাক্কুসী ধ্বসিয়ে নিয়ে যায় আলাদা কথা। হয় মেঘনা নয় গরমেণ্ট—ও দুটো উৎপাত যদি না হয় তবে যে তিন কানি ঠিক সেই তিন কানিই থাকবে। ধানি জমি তার—মেঘনা বাঁকের চরে। বোশেখে যখন ঘোলা জোয়ার ওঠে—জল যেন ঠিক এমন করেই ফোটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাই ছায় বড় বড় রুই কাতলা পোমা পাঙ্গাস।

কড়ায় ফুটন্ত ডালে নিয়ন বাতি পড়ে মেঘনাকে মনে করিয়ে দেয়—ঠিক সে রকম—ঠিক যেন বর্ষার জোয়ারে ঘোলা মেঘনা।

বৌ। ডাকল দীনবন্ধু।

সারদা শুনতে পায় না। আবার ডাকে দীনবন্ধু, অ-বৌ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সারদা। চট করে বলবের দিকে নজর গেল—আগুন ত রয়েছে তবে আবার খোসামুদে স্বর কেন?

আচ্ছা কলমদ্দির বন্দডা কানাই যে সনে অয় হেই সনেই কেনা অইছিল তাই না রে? মেঘনার বাঁকের জল-টলটল ধান জমির কাঁদাড় থেকে শিয়ালদা ষ্টেশনের এক উদ্বাস্তু রমণীর কাছে চলে এসেছে দীনবন্ধু। ওটা জানা তার বিশেষ দরকার। এবং এখনই। খবরটা এখনই দরকার।

সারদাও কী ভাবল—সেও ফিরে গেল অনেক পিছনে। একটুখানি ভেবেই বলল, হয়, কানাই তহন দুমাসের।

দীনবন্ধু প্রতিবাদ করে, না-না কানাই হওনের আগে। কানাই

অইল পোষ মাসে, জমি দলিল অইল বড় পূজোর বন্দের পর আদালত খুললে।

হয়, তমায় কইছে! আদালত খুললে দলিল অয় নাই বায়না অইছিল। তারপর—

কী যে রম্বা কাষ্ট কস তুই! বালো কইরা ঠাওর কর দিনি!

অ আমি অনেক দিন আগেই কইরা সারছি—এ্যাহন তুমি ছ্যাহ। পষ্ট সরণ রয়েচে এ্যাহনও—জমির দলিল সাইরা বাইরের দাওয়ায় বইলা—মোক্যদা গেল হাতপা ধোওনের জল দিবার লাইগ্যা, টপাস করে তার হাত ধরলা—হে কী কান্না ছেমড়ীর।

দীনবন্ধু দ্রুত টান দিতে লাগল হুঁকায়। অনর্গল ধোঁয়া বেরোয়—কড়া কাঠ তামাক, দাকাটার মতই তলব। উগ্র ঝাঁঝে পরিষ্কার হয়ে যায় মাথাটা। এই ত সেদিনকার ঘটনা—যেন পরশুর কথা, এত স্পষ্ট এখনও। মোক্ষদা শালী। বছর এগারো বয়স তখন। তবু তার শাড়ী পরা দেখলে বুড়ো ধুড়োরা পর্য্যন্ত হেসে ফেলে—এত মাতব্বরী শাড়ীর প্যাঁচে। ঘন ঘন বুকে কাপড় তুলে দেয় যার অস্তিত্ব নেই তাকেই ঢাকতে। হাসি লাগত দীনবন্ধুর। বেশ লাগত দীনবন্ধুর—কাে . মাটির পুতুল যেন। চোখে কেমন যেন থতমত খাওয়া ভাব এসে গিছল ঐটুকু বয়সেই।

সারদাই ঠিক বলেছে—সেদিনকার ঘটনাই বটে। মোক্ষদার হাত ধরে দীনবন্ধু শুধুমাত্র বলেছিল, কি গো ছোটবৌ যাও কই, বসো, তুগ্ গো মনের কতা কই। ব্যস! ভঁ্যাক করে কেঁদে ফেলল ছেমড়ী! এই সেদিনও সেকথা নিয়ে কত হাস-তামাসা করেছে—বাব্বা এখন সেই মোক্ষদার মুখের সামনে দাঁড়ায় কে: কথা নয় ত যেন বোশেখী ঝড়ে আটচালার এক একখানা টিন খুলে ছুটছে।

অরা কী ফুলিয়াতে আছে এ্যাহনও? জিজ্ঞাসা করে দীনবন্ধু।

কারা? মোক্ষদা? হয়। আর যাবে কৈ? আর যাওনের ঠ্যাকাডাই বা কী? জায়গা কিনচে ঘর তুলচে—কত কইল হে সময়,

তা না কোট ধইর‍্যা বইয়া রইলা গরমেণ্ট আনচে গরমেণ্টই পুনর্ব্বাসন দিব। দিছে—এ্যাহন বোজ! বল মা তারা কনে দাঁরাই—হেই অইচে আমাগো। ঘরভিটি ছাড়ছি—হেই বাস্তুর শাপ যাব কই?

সারদার চোখে মুখে দীনবন্ধুর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ। প্রতিবাদ একটা করে দীনবন্ধু—তবে ঘন ঘন তামাক টানার মধ্য থেকে শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে নিজেকেই সে কোন ভাঁওতা দিতে চাচ্ছে। একবর্ণও বোঝে না সারদা। অনেকক্ষণ পরে বলে, অইব অইব—বেবাক ঠিক হইব আবার। ত্যাহো যাওনের আর বড় বিলোম্ব নাই ঠ্যাহে যেন।

চোখের ওপর ভেসে ওঠে আধকানি জমির ওপর বাড়ীটা। জমির চারিধারে নারকোলের সারি। পুকুর পাড় জুড়ে সুপারীর জড়াজড়ি ভীড় ঘন সন্নিবদ্ধ সুপারী কুঞ্জ। থমথমে জল পুকুর—শনের ঘর। সবকিছু—সর্বস্ব।

কানাইএর বিয়েটা এবার আর না দিলে নয়। বয়েস হয়েছে—যে সময়ের যা। এখন বিয়ে না দিলে আর ফুর্তি আমোদ করবে কবে? মেয়েটাও ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বলে। মেয়ের কথা মনে হতেই পাশে দৃষ্টি চলে যায় দীনবন্ধুর। ঘুমুচ্ছে মেয়েটা—দুদিন ধরে আমাশা। একফোঁটা ওষুধও পেটে পড়েনি। সবই পয়সার খেলা। দু'চামচ ছাগল দুধে দশ ফোঁটা জামপাতার রস—বড়জোর তার ওপর দুটো ডাব—আর কী লাগে এ রোগ সারাতে। সকালের কথা মনে হতেই সারা দুনিয়াটার ওপর আক্রোশ পড়ে ওর—পাঁচ আনা চাইল এট্টা কথবেলের মতো ডাব! নেহাৎ কলকাতার বাড়ী তাই নয়ত এ্যায়সা চোপাড় দিত! এরা পয়সাটাকে ভাবে কী! মানুষ থাকে এদেশে!

আর যে থাকে থাক দীনবন্ধু থাকবে না। আর কটা মাস ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে পারলে হয়—ড্যাং ড্যাং করে বাড়ী উঠবে গিয়ে—

এ হতেই হবে—মন বলছে তার এ হবেই। তাছাড়া মহাপুরুষদের কথা—ও সাক্ষাৎ বেদবাক্যি। হতেই হবে।

নিজের ঘরদোর বাগানপুকুর ক্ষেতখামার। ছোট এক মাল্লাইএ কেরায়া বাইবে বুড়ীর চুলের মত পাট, আশ্বিন মাসের কাঁচা রোদের মত ধান—কাঁচা পয়সা—কদ্দিন যাবে সামলে নিতে? কানাইডার আর এই গাড়ীতে গাড়ীতে পাঁউরুটি লজেন্স বেচে বেড়াবার ঠ্যাকাটা কী! লাগবে ধান পাটের চালানী কাজে—তুদিনেই লাল। কি হাল হয়েছে ছ্যামড়ার—যেন শুকনো গৈলে দড়ি একখানা! পয়সাকড়ি না থাকলে পুরুষ মানষের ঐ হালই হয়! পয়সা নয়ত—পুরুষ মানষের সোয়ামী!

ওপাশে সুরেন বিশ্বাস তুহাতে বুক চেপে ধরে কাশছে। এখানে এসে অব্দি কাশছে। কদ্দিনের ব্যামো জানে কে বা! বলে ত শ্যালদায় এসে ধরেছে! কী রোগ কে জানে। সুমুখে মাটির খুরী একটা তাইতেই কফ গয়ার ফেলে আবার কাশে। কাশে রাতদিন সমানে—লোকজনের হৈচৈতে দিনের বেলা শোনা যায় না এই যা। রাতে শোনা যায় দেখা যায়! কাশির দমকে নীল হয়ে যায় বুড়ো। ভয়ভয় অসহায় ড্যাবডেবে চোখ তুলে বিবর্ণ মৃত্যুর স্থির পদক্ষেপ দেখে যেন!

নিতাই মণ্ডলের স্ত্রীও কাদিন ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাচ্চা হবে। হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বাঁচা মুস্কিল আবার হাসপাতালে পাঠাতেও পারছে না—আন্দামানের ডাক হবে তুএকদিনের মধ্যেই। তিন বছর শিয়ালদায় কাটাচ্ছে—এ ডাক ফেরত গেলে আর কোন উপায় নেই! তিন দিন ধরে সমানে কাতরাচ্ছে বৌটা—তুচোখ দিয়ে জল ঝরছে হয়তো লজ্জায় নয়ত নিজের উপর ঘৃণায়। নতুন মানুষ আসছে আনন্দ নেই উল্লাস নেই—আছে শুধু ধিক্কার আর সেই অনাগত অবশ্যম্ভাবীর জন্য অজস্র অভিশাপ। সন্তান ত নয় একটা দানব ঢুকেছে পেটে। সন্তান হলে কী মাকে এত কষ্ট দিতে পারে! তার ওপর পেটে ভাত পড়েনি তুবেলার একবেলাও। কারা এসে

ওর ফটো তুলে নিয়ে গেছে, খানিকটা গুঁড়ো দুধও দিয়ে গেল তারা, হলে কী হবে এক ফোঁটাও পেটে গেল না। চার চারটে বাচ্চা—কাকে বঞ্চিত করে নিজের মুখে দেয়! দূর শালা মা হওয়ায় ঘেন্না ধরিয়ে দিল।

কার কথাই বা ভাববে দীনবন্ধু—মনে পড়ে হরিসহায় ভক্তের বড় মেয়েটা কানাই এর চেয়েও দুএক বছরের বড় হবে—সেদিন সারারাত কোথায় কাটিয়ে সকালে এসে হাজির। আজকাল প্রায়ই যায়—রোজ যায় কী না কে জানে—কে অত লক্ষ্য করছে। সতীশ হালদার—খুলনা বাগেরহাটের সতীশ হালদার—তার বৌ এসে সারদার সঙ্গে গল্প করে গেছে। হরিসহায়ের বৌ না কী চেপে যেতে চেয়েছিল—শেষ পর্যন্ত যখন দেখলে সব জানাজানি হয়ে গেছে বলল নারকোলডাঙ্গায় পিসীর বাড়ী গেছে। নারকোলডাঙ্গায় পিসী রইল আর ওরা কেউ জানলো না এ কেমন কথা। পিসীকে একদিনও বেড়িয়ে যেতে দেখল না ত কেউ।

জানে কেডা —হেই ভগোবান ব্যাটাই জানে! কে কনে যায় কী করে কে আর নিকেশ রাহে কন! আপন টাক বিষ করছে পরের টাকে ফুঁ দেয় কেডা! তয় আমাগো ইন্দু কতিল একজনার সাথে না কী বড়রাস্তা দে গঙ্গামুখো যাতি দেখিল। পিসীই অইব—তয় হে পিসীর কাচাকোঁচা দুই-ই আচে। একজোড়া মোচও যেন আছিল মনে লয়!

বলল অক্ষয়ের মেয়ে মানুষটা। বৌ নয়—ফ্যামিল করা—ওরা বলে। পাকিস্তান থেকে মাইগ্রেসন করে আসবার সময় পাড়ার এক বিধবাকে বৌ সাজিয়ে মাইগ্রেসন করেছে—নয়ত পুনর্বাসন পাওয়া যাবে না। ফ্যামিল্লি কর্‌া বৌ কথাটায় আর লজ্জার বা লোকভয়ের নেই কিছু। অতুল বলেছিল—পাকিস্তানে ব্যাওয়া মাতারি খুঁজে পাওয়া ভার। নিম্নবর্ণের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও বর্ণ হিন্দু ঘেঁসা যারা তারা প্রায় ব্যবস্থাটা বাতিল করে

এনেছিল। দেশ ভাগ এবং বাস্তুত্যাগের হিড়িকে সে কৃত্রিম বাঁধ প্রথম ধাক্কাই সামলাতে পারে নি।

—হয় কে আর কারডা ছ্যাহে কন! লবণ আছে এট্টু ছ্যান না বাই।

এতক্ষণে কাজের কথা পাড়ে অক্ষয়ের বৌ। জলবাত রয়েচে হুগগো। আপনার দেওররে একটু লবণের জন্যে দিতি ঠেকচি। আর ঐ হুগগো কাঁচা মরিচও ছ্যান দিমু ঐ সঙ্গে।

বালো সামিগগিরিই চাইলা বুনডি—লবণ আমারও নাই—আনবার কইচি—তা—

সারদাকে থামিয়ে দেয় অক্ষয়ের বৌ। ঐ ত প্যাচায় দেহি যেন—আমার এই এটটুস দিলিই অবেয়ানে।

সারদা পিছনে তাকায়। কতদিন সাবধান করেছে মেয়েটাকে যে জিনিসপত্র সব সাবধান করে রাখবি। যত সব নি-ভাতির দল এসে জুটেছে শ্যালদার বাড়ীতে—যা দেখবে তাই চাইবে—তা কী শুনবে মেয়েটা! তেমন ভাগ্যই বটে সারদার!

মিথ্যা ভাষণটা হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতে অপ্রস্তুত হয় সে। বলে, অই ছ্যাহেন—হুপুরে বাত খাওনের আগে হু-পয়সার লবণ আনছিল ভুইল্যা সারচি! দারান এট্টুস—

একখাবলা নূন তুলে নিয়ে একটুকরো কাগজে মুড়ে ওর হাতে দেয় সারদা। নূনের পরিমাণ দিয়ে বোঝাতে চায় যে মনের ভুলে মিথ্যা বলেছে তা বলে নজর তার ছোট নয় এবং এই যুক্তি জোরদার করবার জন্য কাঠের বাক্স থেকে হুটো আস্ত কাঁচা লংকাও বার করে দিতে হয়।

মনে মনে হাসে অক্ষয়ের বো। জলের ঘটিটা নামিয়ে নূনটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, এবার চলি—কই আমাগো ছিটে ত বেরাতে যান না দেহি। যাবেন। এট্টুস খাবার জল নিতি আওন লাগল মনে ঠিক দিলাম যাই কানাইয়ের মার ঠাঁয় এট্টুস লবণ মেগে

আনি। আপনার ছ্যাওর কাজ থে আইয়া বইয়া রইচে বাতের লাইগ্যা চলি যাই—অ-দ্দি যাবেন বেরায়ে আবেন।

চলে যায় অক্ষয়ের বৌ। মনে মনে তাকে শাপান্ত করে সারদা। ছেনালী দেখলে গা জ্বলে যায়। ব্যাওয়া মাতারীর ঠসক ছ্যাহ না! বের ভাতারএর কতা এ্যাহনও পাঁচজনকে কত্তি সরম লাগে আর নিকের ভাতার নে ঢলাচ্ছে ছ্যাহ না!

রাত অনেক হল। জিনিসপত্রগুলো সব সামলে রাখতে ব্যস্ত হয় সারদা—যেটি এদিক ওদিক হয়ে থাকবে সেটি যাবে।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। নটা পাঁচ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। প্যাসেঞ্জার ভর্তি হচ্ছে। ছাড়বার সময় হয়ে এল প্রায়। ষ্টেশনের ভীড় কমেছে অনেকটা। সেই ভোর বেলা যে মাতন সুরু হয়েছিল এবার ভাঁটার টান ধরেছে তাতে। ধীরে ধীরে সব ঝিমিয়ে যাবে। বাইরের লোক একটাও থাকবে না প্লাটফর্মে। এগারোটার গাড়ীটা দেখে নিয়ে এক নম্বর আর দু নম্বরে চট বিছিয়ে শুয়ে পড়বে কুলিগুলো। অফিসে বসে চা সিগারেট খাবে আর ঝিমুবে গেটবাবুরা। লাউডস্পীকার থেমে যাবে—গাড়ী-ই নেই। তাদের আসা যাওয়ার ঘোষণারও প্রয়োজন বন্ধ কিছুক্ষণের জন্য। ষ্টেশনের বাইরে হিন্দু আর মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ষ্টল দুটোর দুচারজন রাতজাগা যাত্রী বসে বসে মশা মারবে আর শাপশাপান্ত করবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। বিড়ি টানবে। অনেক দূর থেকে প্রতিমিনিটে দু-একখানা নিঃসঙ্গ লরী বা ট্যাক্সির হর্ণ শোনা যাবে। ষ্টেশনের পাশে কবরখানায় নেমে আসবে অখণ্ড নীরবতা। হয়ত একটা প্যাঁচা ডেকে উঠবে কোথা থেকে—নয়ত কোন কাক স্বপ্নের ঘোরেই পরিত্রাহী ডাক ছাড়বে ষ্টেশনের কবরখানার কলাবাগান থেকে। বিজলী বাতির প্রসাদ বঞ্চিত কবরগুলোর পাথর বা কাঠের ফলকে নামলেখা মানুষগুলো কবর ছেড়ে উঠে আসবে। উঠে আসবে ভরা ভরা বিস্মিত চোখে। বিবর্ণ ম্লান জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে থাকবে এই

প্লাটফরমের উদ্বাস্তুগুলোর দিকে। মাথার ওপরে একটা কাক হয়ত স্থান পরিবর্তন করবে পাখার ঝাপটা দিয়ে। তিত্তিবাদুড়টা মোচায় নখ বাধিয়ে ঝুলবে। চিবিয়ে রস নিংড়ে নেবে মোচার ফুল থেকে।

এরাও ঘুমুবে—তবু জেগেও থাকবে অনেকেই। জেগে থাকবে নগেন মিস্ত্রীর বৌটা—পাহারা দেবে ক্ষয়কাশের কাশীকে ফাঁকা দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ে নগেন। এক সময় পা টিপে টিপে ওর পাশ থেকে উঠে গিয়ে ঢুকে পড়বে চারনম্বরে দাঁড়ান রেকের একদম সুমুখে কোন কামরায়। সুরেন মৃধার তৃতীয় পক্ষের বৌটা গিয়ে যে কামরায় ঢুকবে সে কামরায় উল্টা দিক থেকে রুগ্ন বৌটার জ্বলজ্বলে চোখের সামনেই যোগেশ শীল গিয়ে ঢুকবে—দোরটা বন্ধ করে দেবে ভেতর থেকে। আরো অনেকে—আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে একটু কম—তারা কয়েকজন বিকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ত আজো বেড়িয়ে আসতে গেছে। একজন বুঝি ফিরেছে এখনো বাকী তিনজন।

আর জেগে থাকবে দীনবন্ধু—হিসাব করবে তিন কানী জমিতে বীজ লাগবে কতটা। শুধু আশ নয় আমনও। আশ বুনবে বোশেখের পয়লা গোনে। কালবোশেখেয় পয়লা বন্যায় পলি ঢাকা তিন কানী যুবতীর পুরুষ্টু ঠোঁঠের মতই রসালো, উন্মুখ। লাঙ্গলের ফলার নির্মমতার তৃপ্তিতে মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে দেবে বাতাসে। মাটি—সন্দেশের মত মাটি। নরম নরম—অনেকদিন আগেকার সারদার বুকের মত নরম! ভিতরে স্নিগ্ধ কুসুম কুসুম গরম। উম্! সেই প্রাণস্রাবী রস আর উমে ধান ফেটে বেরুবে মাখমের শলার মত অংকুর।

দীনবন্ধু জেগে থাকবে। উঠে বসবে দীনবন্ধু। কত দিন আদর করে নি সারদাকে। কতদিন! প্রায় দুবছর হতে চলল। চারদিকে তাকাবে একবার। ওদিকে বুড়ো অনুকুল বসে তামাক খাচ্ছে। ওজনের কলটার ওপর দুটো কুলী বসে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। জেগে রয়েছে মেয়েটা। কানাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। গালের ওপর

বসে একটা মশা রক্ত শুষে লাল হয়ে উঠেছে। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে মশাটা মারবে দীনবন্ধু। হাতটা দেখবে চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে। এ কী রং রক্তের—লাল নয়ত! যেন বেগুনী। বাঁ হাতে চোখটা রগড়ে দেখবে। বেগুনী নয় অন্য কী রকম রং একটা! লাল নয়! তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাবে ঐ শয়তানী আলোর কারসাজী। ছেঁড়া কাঁথাকেও কেমন গালচে গালচে দেখায়—ঠিক যেমন মেজকর্তার বৈঠকখানায় বিছানা থাকত—ঠিক তেমন নয়, তার চেয়েও ভাল তার চেয়েও সুন্দর—যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন।

তামাক সেজে বসে বসে টানবে দীনবন্ধু—তিনকানী ধানী জমির হক মালিক সে। মালিক সাড়ে তেরোগণ্ডা সুপুরী গাছের। ভারানী খালে ঘাট আছে তার নিজের। একমাল্লাইখানা বাঁধা থাকে ঘাটের ওপরে গাবগাছের শিকড়ে। দোলে নাচে—ছটফট করে মাঝদরিয়ায় ভেসে পড়বার জন্য। আরো কত কী-ই ছাড়াছাড়া অসংলগ্নভাবে মনে আসবে তার—ঘুমুতে ইচ্ছেই হবে না। ঘুম ছেড়ে গেছে যেন। ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল আর এখানকার বাসিন্দা সংসারগুলোর নিরূপায় অনাচারের কদর্য গন্ধে তামাকের মিষ্টি গন্ধটাও হারিয়ে যাবে। কেবল তামাকের ঝাঁঝ—উগ্র ঝাঁঝে গলাটা চিড়চিড় করবে। কাশবে। থপ করে গয়ার ফেলব সামনের বরফীকাটা মেঝেয়। প্লাটফর্মের নীচে লাইনের তলায় মুড়ির মত ঢ্যাবা ঢ্যাবা সাদা গুয়ে পোকাগুলো কিলবিল করবে অপার স্ফূর্তিতে!

সারদার ঝিমুনী এসেছিল। চটকা ভাংতেই উঠে গিয়ে লাউএর শুকনো খোল আর নিজের একদা-খয়ের পাড় শাড়ীটা এনে বসে। শিরা-উপশিরার মত সেলাই কাপড় খানার দুমুড়োয় কয়েক ইঞ্চি করে বহর কমে গিয়েছে। লম্বালম্বি টাঙ্গিয়ে দিলে বাতাসে খোলা পালের মত দেখায়। আর চলবে কদ্দিন? ঘর ছাইবার টিন নয় ত! লাউয়ের খোলের মধ্য থেকে ছেঁড়া পাড় বার করে সূতো তোলে সারদা। তিন থী একসঙ্গে—একপ্রান্ত দু আঙ্গুলে পাকিয়ে নিয়ে

সুতো পরাতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ে। রাত আর ঐ রঙ্গীন আলোয় মতলব করে সুচের ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছে মনে হয়। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সারদা। না—পোড়াচোখের মাথা—! দূর ছাই।

পাশের একটা মেয়েকে সুচ আর সুতোটা এগিয়ে দেয়। বলে, সুতোডা গলিয়ে দেত বুনডি। চোক্যের কম্ম কাবার কইরা থুইছি মনে কয়।

না থুয়ে আরও কদ্দিন থাকবে আজিমা? হাসে মেয়েটা। কৌতুক ভরা সে হাসি—শান্ত বেদনামৌন রাতে একটু হঠাৎ দাখনার সাথে একফালি চাঁদের আলো যেন।

আপন মনেই গজ গজ করে সারদা। নিজের ভাগ্যকে এনে কাঠগড়ায় তোলে। সব দোষ পোড়া ভাগ্যের! কত জন্মের মহাপাপ এ জন্মের জন্য জমা করা ছিল কে জানে!

কোন আশা নেই ভরসা নেই—ফ্যালফ্যাল চোখে কেবল অন্ধকার অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকা—সভয়ে চোখ বুজিয়ে নিতে হয়। কেউ নেই, কিছু নেই—এই নরককুণ্ড থেকে যে কোনদিন নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে আশা করাও মিথ্যা!

প্লাটফর্মের ওপ্রান্তে হৈ-হৈ করে ওঠে কারা। দলে দলে লোক দৌড়ায় ঐ দিকেই। গাড়ীটা থেমে গেছে। পুলিশ ছোটে—গম্‌গম্ আওয়াজ হয় বুটের। দীনবন্ধুও কখন উঠে গেছে ওদিকে। হাতের সেলাই ফেলে উঠে দাঁড়াল সারদাও। পাশের মেয়েটা একবার উঠে দেখে বসে পড়ল। কেউ চাপা পড়েছে বোধ হয়—নির্লিপ্তভাবে বলল সে।

কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়েছিল ঠিক নেই সারদার। দীনবন্ধুকে আসতে দেখে ভীড়ের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায়। নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসে যেন। বুক অজানিত ভয়ে গুরগুর করে—কানাই ফেরে নি এখনো।

বাঁচবে না—মাথা ফেটে ফুটিফাটা হয়ে গেছে।

মেয়ে মানষের জান—গেলেই হল!

উঃ খাসী কাটলেও অত রক্ত বেরোয় না।

মানুষ ত আর খাসী নয়!

ফিরছে অনেকে। ওদের কথাবার্তায় সারদা যেটুকু বোঝে বুকের গুরগুরণি বাড়ে তাতে—আহা কে গেল!

মানুষ কাটছে? আহা কাগো ছাওয়াল কবে কেডা!

কাটে নি। দীনবন্ধু দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে। ঝিমঝিম করছে মাথার মধ্যে। বলতে থাকে, কাটলেই বালো আছিল বৌ··· দুখান হয়ে কাটলেই বালো আছিল। মরে নাই ছেমড়ী—অয়ত মরবে না! মাতাটা ফাটছে—গ্যান নাই—আসপাতালে নে গ্যাল।

কে অয়—চিনলা? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সারদার। পাশে চকিতে দেখে নেয়। ঘুমুচ্ছে—রমলা ঘুমুচ্ছে।

ন্যাপাল মিত্তিরের বড় মাইয়া। গারীডা আওঅন কালে জোব্বার লাফই দিচিল—এট্টুর জন্যে চাকার নীচে না গে টাক খাইয়া মেল্যা পড়ছে! অয় মরবে না মরবে অর প্যাডের ডা!

প্যাডের ডা! অর ত—

বিয়া অয় নাই—তাতে অইল কী! বয়েসডা ত বইয়া নাই হের লাইগ্যা—তিরিশের লাগ ধরচে মনে লয়—আইস্যা গ্যাচে, ছাওয়াল আইস্যা গ্যাচে—অয় তার কী করবে! হয়—অর যা করণের আছিল অয় তা ত করছিল—ভগোবান ব্যাডাই বাদ সাধচে। এ্যাহন হেই ব্যাডারই মানত কর অয় যেন আর বাইচ্যা না আহে! এই পিরথিমিডাই কসাইখানা বৌ, এ পিরথিমিডাই কসাইখানা! তিল তিল কইর‍্যা মাইর‍্যা থোয় মনিষ্যিরে! তুঁষ জ্বলুনি জ্বলনের থে অয় য্যান আজই মরে। হেই বালো অইব! বাতের চিন্তে থাকবো না, যৈবন জ্বালাও থাকবো না—আর যেন অয় না জম্মায়, এ শালার দুনিয়ায় জম্মানো তো বুকের খালে পরের ডংকা ছাওনের লাইগ্যা!

কাশির বেগ এসে থামিয়ে দেয় দীনবন্ধুকে। চোখ দুটো জ্বলছে যেন দীনবন্ধুর। বজ্রাহতের মত নিষ্পন্দ বসে থাকে সারদা। ভাববার শক্তি তার নেই একটুও। সেই মেয়েটাও দীনবন্ধুর দিকে তাকিয়ে ছিল। নজর ঘুরতেই দেখে একজন তাকিয়ে রয়েছে ওরই আঁচল খসে পড়া স্ফীতবক্ষের দিকে। আঁচল তুলে দেবার সময় একটু হেসেও ফেলে হয়ত। দু গালে অরুণরাগ ছড়িয়ে যায়। মুহূর্তে আফিংএর বিষে নীল হয়ে যায় যেন। বুকের কমনীয় উষ্ণতা নিঃশেষ করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটা। দুচোখে নেমে আসে শ্রাবণ আঁধার।

জেলগেট থেকে বেরিয়েই পথ। দুদিকে কতদূর চলে গেছে? বোধ হয় যতদূর হাঁটা যায় তার চেয়েও দূরে। পথে নেমে নিরুদ্দেশ্যে হুহু করে খানিকক্ষণ ঘুরল কানাই। কত ভয় ছিল, কত সংশয় আর সংকোচ ছিল মনে। পথের দুধারে হয়ত লোক দাঁড়িয়ে যাবে তাকে দেখে—আঙ্গুল দিয়ে এ ওকে দেখিয়ে দেবে। বলবে ঐ লোকটা জেল খেটে বেরুল! কিন্তু কই কেউ ত একবার তাকিয়েও দেখল না তার দিকে। যত মানুষ আসে যায় সবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে কানাই—না জেল খাটার পরে কোন পরিবর্তনই নেই পৃথিবীর ওর জেলে যাবার আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। বরং মনে হয় ভুল হয়েছিল তারই—দুনিয়ার মানুষগুলোকে নির্দয় বা নিষ্ঠুর ভাবা তারই চিন্তার দৌর্বল্য। মানুষ সত্যিই অত নীচ নয়—অত হীন নয়। তাকে বিদ্রূপ করার জন্য বিশ্বের মানুষ লার পথে সামিল হয়নি।

ঈশ্বরী বোধ হয় জানে এ তথ্য—তাই সে অত নির্বিকার অত আশাবাদী। পাঁচ বছরের মেয়াদ—সে কী সোজা কথা! তিন দিনেই ওর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল (ইচ্ছে হচ্ছিল কেন, সত্যি সত্যিই

কেঁদে ফেলেছিল) আর ঈশ্বরী জেলের ঘণ্টা ধরে সব করে চলেছে। হাসিমুখে। কেউ না কী ওকে রাগতে দেখেনি কোনদিন।

এক গাছতলায় দাঁড়ায় কানাই। কোন কারণ নেই তবু দাঁড়ায়। বড় ভাল লাগে পিচঢালা সোজা পথটাকে দেখতে—কতদূর দেখা যায়, তারপর লুকিয়ে পড়েছে গাছপালার ভীড়ে। মুক্তি—অগাধ এবং অপার মুক্তি—কোন নিয়ন্ত্রণ নেই পথ চলায়।

শূন্য আকাশে সদ্য শিকল ছেঁড়া একটা পাখা উড়েছে যেন—সারা আকাশটাই সে মেপে ফেলতে চায় তার দুখানা অনভ্যস্ত দুর্বল ডানায়।

বড় ভাল লোক ঈশ্বরা। ও না থাকলে প্রথম রাতটা না খেয়েই কাটত। কোথা থেকে একটা খানা এনে দিল সে। রুটি ভাজি আর ডাল। খোসা মেশান অড়হর ডাল। ও না থাকলে কী করে যে কাটত তিনটে দিন!

ওর কথাগুলো শুনতে বড্ড ভাল লাগে। সব অবশ্য বোঝেনি কানাই—অমন করে ভেবেই দেখেনি কোনদিন তার আর!

আগের রাতেই বলছিল ঈশ্বরা। কথাগুলো এখনো ওর কানে বাজছে—আজ যাদের কিছু নেই কালকের দুনিয়াটা তাদেরই। আজ থেকেই তারা দুনিয়াটাকে ভেঙ্গে গড়বার কাজে লেগে গেছে—সবাই—সক্কলে। মানুষ যত কষ্ট পাচ্ছে ততই বুঝছে আজ আর একলা বাঁচবার উপায় নেই, বাঁচতে হবে সবায়ের সঙ্গে—ভোগ দুর্ভোগ সব সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে।

সে আরো বলেছে, মানুষ বাঁচবে সবায়ের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে—সমান অধিকার খাটুনীতে—আকাশ বাতাস মাটিতে সমান অধিকার সমান অধিকার পৃথিবীর জল হাওয়ায়, খেতের ফসলে, জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যে!

আরও বলেছে সে, মানুষ বাঁচবে বলেই জন্মেছে—বাঁচার পথের কাঁটা নির্মম হাতে উপড়ে ফেলতে হবে। একজনের জমা করা

সম্পদের বোঝা বইতে গিয়ে কেন আর পাঁচজনের পাঁজরা ভাংবে? কিন্তু সে সমবাটোয়ারার উপায় কী?

খানিক পরে মনে হয় গলাটাই শুকিয়ে উঠেছে—অন্যমনস্ক থাকায় বুঝতে পারে নি কানাই। পকেটে মাত্র একটাকা সাড়ে সাত আনা পয়সা আর আধ বয়েম লজেন্স—জমা ছিল জেলগেটে। ছাড়বার সময় ফেরত দিল। খিদেও পেয়েছে—ছাড়া পাবার আনন্দে বরাদ্দ নাস্তা ছোলা ভিজানো আর ভেলিগুড়ের ডেলাটাও খেয়ে আসেনি। কিছু খেতে পারলে মন্দ হত না—দু খানা সিঙ্গাড়া কী আলুর চপ খানচারেক। ছাড়া যখন পেয়েছে খাবে একদিন—জেলে বসে বসে কত কীই খাবার কথা মনে হত। মনে হত একবার ছাড়া পেলে হয়! কিন্তু ছাড়া পেয়ে দেখছে খাবার ইচ্ছার চেয়ে উপায়টারই অভাব। পয়সা ত আর খোলামকুচি নয় যে এককথায় দু আনা খরচ করে ফেললেই হল! অগত্যা দুটো লজেন্স গালে পুরে দেয়—চুষে খাবার মত দেরীটুকুও সয় না। মড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে রাস্তার কল থেকে এক পেট জল খেয়ে নেয়। কপালে মুখে জলের ঝাপটা দেয় তারপর কাপড়ের খুঁটেই মুখ হাত মুছে আবার চলে। খালি পেটে জল পড়েছে, প্রতি পদক্ষেপে ঝকাৎ ঝকাৎ করে আওয়াজ হয়—এক অস্বস্তিকর ব্যাপার! গালের দাড়িগুলো কুটকুট করছে, মাথার মধ্যে যেন গোটা পাঁচছয় ঝিঁঝিঁ পোকা ঢুকে কোরাস ধরেছে!

আজকের দিনটা ত এভাবেই কাটবে—কিন্তু কাল থেকে? আবার কী লাইনে বেরুবে? না অন্য কিছু? বুকের মধ্যে বয়েমটা জোর করে চেপে ধরে সে। অন্য সর্বদিকই ত অন্ধকার। এ ছাড়া আর করার নেই কিছু।

অন্য রকমের ভাবনাও যে না হয় তা নয়। এতদিনে লাইনে হয়ত কত ওলট-পালট হয়ে গেছে। হয়ত আর একটা ক্যানভাসারও নেই। তাহলে?

বাবা মা বোন—ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকটা। সেবারের মত এবারও যদি কোন মন্ত্রী আসবার অছিলায় শিয়ালদা থেকে কোথাও ওদের সরিয়ে দিয়ে থাকে? যদি তাদের আর খুঁজে না পায়? বুকটা অসম্ভব রকমের ধড়ফড় করে—রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ভেবে পায় না এখন তার কি করা উচিত, কোন পথে হাঁটা উচিত। হাঁটবার কথা যেন ভুলেই গিয়েছে সে। সুমুখে পিছনে প্রশস্ত পথ আশেপাশে সড়ক গলি—তবু তার চলার পথটা কে যেন কোন চিহ্ন না রেখেই মুছে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে পকেটে হাত পুরে দেয়—বিড়ি দেশলাই। নেই কো। পাশের দোকান থেকে দুপয়সার বিড়ি কিনে অন্যমনস্কভাবে চায়ের দোকানে ঢুকে একগ্লাস চা খেয়ে একটুকরো কাগজ জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে পথ ধরে সে।

সারদা কানাইকে আর বেরুতে দিতে চায় না। ওর মাতৃসুলভ সহজ বোধ থেকে বুঝতে পারে কী একটা অঘটন নিশ্চয়ই ঘটেছিল। কিন্তু অঘটনটা যে কী কানাইকে হাজার জিগ্যেস করে জানতে পারে নি। কানাই একদিন বলল, ভুলে দিল্লী মেলে উঠে দিল্লী চলে গিছলাম সেই গাড়ীতেই ফিরে এলাম।

বিশ্বাস করে নি সারদা। বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে নয় মনটা বিশ্বাস করতে চায় নি। এইটুকু ভুলের জন্য তিনদিন প্রায়শ্চিত্ত হবে কেন? তবু হয়েছে—ভুল না করেই কানাইকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। দিল্লী যেতে হয় নি—সেখান থেকেই ওর জীবনের তিনটে দিনকে মুছে দেওয়া হয়েছে! তার মুখে কালি লেপে দেওয়া হয়েছে।

কালি কী সত্যিই পড়েছে তার মুখে? কানাই অনেক বার

অনেক ভাবে ভাবতে চায়। ঈশ্বরী যেখানে থাকে সেটা কী খারাপ জায়গা—অস্থান ?

এমন করে এর আগে কানাই কোনদিন ভেবে দেখে নি। জেলখানা এতই প্রাচীন যে মানুষের স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ায় মনের কোটরে তার জন্য একটা ভয়ের এবং ঘৃণার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। কাজ বেড়েছে বিশ্বকর্মার। মানুষের দেহে নিত্যনূতন যান্ত্রিক রদবদল করতে করতে বেচারা হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাই হয়ত ক্ষেপে গিয়ে নাদির তৈমুর এর ছাঁচে হিটলারকে ঢালাই করে আবার আদিম সাদামাঠা কাজের দিনে ফিরে যেতে চেয়েছে; চাচ্ছে এ্যাটম বোমার পৃষ্টপোষকতার সাহায্যে সামূহিক ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করতে। বেচারা দেবশিল্পী হলেও জানে না মানুষ তার চিরস্থায়ীত্বের পরোয়ানা নিজেই জারী করে বসেছে। বিশ্বাসের স্বর্গ থেকে দেবতারা ইতিমধ্যেই জুয়াড়ীর দেবতা বনে গেছে—মানুষ তার অবসরের কর্মশালায় নিজের দেবতার ছাঁচ গড়ছে বসে বসে—দিনের পর দিন সঙ্গোপনে। মননের জঠরে হচ্ছে তার পুষ্টি ও ক্রমবিকাশ।

অনুকূল—জেলে গিছল মাদারীপুরের অনুকূলও। মুখ দেখে সবাইয়ের বয়স বোঝা যায় না, অনুকূলেরও নয়। দেখলে ত মনে হয় পঞ্চান্ন—সে বলতো পঁয়তাল্লিশ; একই কথা, দুদশ বছরে কিছু যায় আসে না। জেলে গেল সেও। বিক্রী করত বাদাম। কোথা থেকে পুলিশে ধরল—রেল পুলিশ। বাদাম পয়সা সব ছড়াছড়ি প্লাটফরমের নীচে—ধরে নিয়ে গেল তাকে। সাতদিন ফাটক। অনুকূলের কোটরগত চোখ দুটো একবার ধ্বক্ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে নিভে গেল।

সারাদিন গাড়ীতে কোন ক্যানভাসার নেই। অভ্যস্ত নিত্য-যাত্রীদের কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোথায় যেন সুর কেটে যায় থেকে থেকে। কাদের যেন খুঁজে মরে সারা গাড়ীটা।

বিরাটিতে উঠল অনুকূল। সারাদিনের গুমোট কেটে গেল যেন।

বিভিন্ন গ্রামে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলা ক্যানভাসারের স্বর না শুনলে মনেই হয় না লোকাল ট্রেনে চড়েছি। অনুকূলের আগমন ঘোষণা শুনে হাসি ফুটল কয়েকজন রসিক যাত্রীর মুখে। একজন ডাকল এদিকে এস।

এই যে বাবু—এনারটা দিয়েই যাচ্ছি। হাসল অনুকূল। কদিনেই কপালের রেখাগুলো আরো গভীর হয়ে বসেছে। গলার চামড়া যেন বড্ড বেশী শিথিল হয়ে পড়েছে।

পুলিশ নেই এ গাড়ীতে? হাসিমুখে জিগ্যেস করে একজন। স্বরে তার কৌতুকাভাস।

না বাবু—পাঁচটা পর্যন্ত থাকে। আর এখন থাকা না থাকা দুইই সমান। সারাদিনটাই ত মাটি—এখন আর ক পয়সা বিক্রী হবে! গরমেণ্ট আর আমাদের বাঁচতে দেবে না কিছুতেই! আদাজল খেয়ে লেগেছে! বিক্ষুব্ধ অনুকূল কৌটায় পয়সা রেখে বাদাম ওজন করে দেয় অরেকজনকে। নূনলংকার পুরিয়াটাও দিয়ে দেয় অভ্যাস মত।

বয়েস কত হল তোমার—পঞ্চাশ হবে? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কে যেন।

বিয়াল্লিশ। নেন বাবু—এট্টা আধানী পরে দিচ্ছি।

আনা আছে—এই আধানীটা নিয়ে দাও তবে।

কাজও চলে—চলে গল্পও। সুখদুঃখের গল্প। সংসারের কথা। দুতিন ছেলে তার—একজন স্কুল ফাইনালের ছাত্র বয়েস সতেরো। আর দুজনের একজন নাইনে একজন সেভেনে। তৃপ্তিতে চোখদুটো চিক চিক করে অনুকূলের।

আজকাল লেখাপড়া করে আর হবে কী! দাও ওকেও কাজে লাগিয়ে। বলল একজন। বড় বাস্তববাদী ভদ্রলোক। বয়েসও হল অনেক তার। গালের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ঘৃণা। ঘৃণা দুনিয়াটার উপর। বছর বছর ছেলের দল বেরুচ্ছে নতুন জীবনী-

শক্তির স্ফুলিংগ একেকটা। কিন্তু প্রাণবায়ুর অভাবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজেদের জ্বালিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে তারা।

অনুকূলও পরামর্শ অনেক শুনেছে। আর কান দিচ্ছে না ওতে। বলে, কাজে লাগিয়ে দোব! হাসে অনুকূল। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলে চলে, কাজ বলতে ত এই বাদাম বা জল বিক্রী।

মন্দ কী, দিন গেলে দেড়টাকা দুটাকা—সবচেয়ে বড় কথা রোজগার করতে শিখবে। পয়সা রোজগার করতে শেখাটাই আজকের সেরা শিক্ষা। বলল বৃদ্ধ।

এই নিন ঝালনুন। তা শিখবে বটে। আনিটা বদলে দিন বাবু বড্ড ঘষা। না না অচল নয় তবে আমাদের চালাতে বড্ড ঝামেলা পোহাতে হয়। উপায় সে কিছু করতে পারে তবে কী জানেন—গরম বাদাম হাতে গরম বাবু। সহৃদয় উপদেশের পল্লায় পড়ে সে যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পালিয়ে বাঁচল—পালিয়ে বাঁচল হীন ষড়যন্ত্র এড়িয়ে।

কথা শেষ না করেই অন্যদিকে ঘুরে যায় অনুকূল। দরকার কী কথা বাড়িয়ে। ভদ্রলোকের ডান গালের শিথিল স্নায়ু চামড়াটা বার কয়েক কেঁপে থেমে যায়। লেখাপড়া ত তিনিও শিখিয়াছেন দুই ছেলেকেই। দুজনেই বসে রয়েছে আর্টস্ গ্রাজুয়েট হয়ে। লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের চাকরী তাও পেল না দুটোর একটাও! কবে পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ছেলেদের ওপর আশা কী তাঁর কম ছিল কিছু? কিন্তু আজ ত অন্ধকার ছাড়া তাদের ভবিষ্যতজীবনে সামান্য আলোর চিহ্নও চোখে পড়ে না। শিক্ষকতা করে জীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। এখন নিজের ওপরই ঘৃণা হয়। বিদ্যার কারখানায় তিনিও জীবনভোর লেগে আছেন নকল মানুষ তৈরীর কাজে। একের পর এক বাঁদর গড়েছেন আর তৃপ্তিবোধ করেছেন শিব তৈরীর।

সব ক্যানভাসারই এখন পাঁচটার পর লাইনে বেরোয় পুলিশের

ভয়ে। দলে দলে বেরোয়, বেরোয় ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত। যে কোন মুহূর্তে দরকার পড়লে পরস্পরকে ছিঁড়ে খেতে বাধবে না কারো। প্যাঁচার মত কোথায় লুকিয়ে ছিল সবাই—দিন শেষের ছায়া দীর্ঘ হতেই বেরিয়ে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে ছায়ার আড়ালে আড়ালে।

আকাশ তরুণীর মনের মত ক্ষণে ক্ষণে রং পালটাচ্ছে। সবুজ পৃথিবীটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে দিনান্তিক জ্যোতির বন্যা। বহুদূর আকাশে তখনো চিল উড়ছে একটা। তার সোনালী ডানায় স্পর্দ্ধিত দৃঢ় গতি।

কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই। লজেন্সের বয়মে দৃষ্টি বিবর্ণ বাঁধা ধরা বং কয়টাও যেন বন্দী থেকে থেকে মরে গেছে। মরে গেছে এই ক্যানভাসারদের মতই—যাদের লাইনে বেরুলে আত্মার বালাই নেই। যন্ত্রের নির্দেশে ছটফট করে ঘোরেফেরে ছোটে। থামা দূরে থাক হাঁফাবারও অবসর থাকে না। জীবনটাকে ধরে রাখাই জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা তখন। দেহটাকে বাঁচাতেই হবে। দেহটা জীবিত থাকলে আত্মার সাধ্য কী দেহছাড়া হয়। দেহ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ যেভাবেই হোক সে আছে—দেহ থামলে সে-ও মলো।

এই সহজ সত্যটিকে নতুন করে উপলব্ধি করেছে কানাইরা।

বুঝেছে শুধু পুলিশ কেন কেউই খালি হাতে ফেরে না। সন্ধ্যা যায় দিনের আলোটুকু মুছে নিয়ে, মৃত্যু আঁচলে বাঁধে সমগ্র জীবনটাকেই।

সারাদিনটা কাটাতে হয় বেকার। কোথাও একভাবে বসে থাকতে গেলে শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। নেই ঘরে খাঁইটা বড়। কোন কাজ না থাকায় মনটা কিছু কাজের জন্য নিসপিস করে. তাগিদ দেয়। অন্ততঃ খাওয়া। কিন্তু পয়সা কই? হাজার বার প্রলোভন সামলেও পাকস্থলীকে থামানো যায় না। তার জন্য অন্ততঃ

তুগেলাস চায়ের দরকার—তার দামও তুআনা। তুনিয়ার কিছু মানুষের কাছে তুখানা গিনিও ঐ তুআনার চেয়ে সস্তা!

চুপ করে বসে থাকতে হলে বিড়ির খরচ বাড়বেই। এক আনায় দশটা বিড়ি, সে আর কতটুকুর মামলা। অথচ সারাদিন-ভোরে একটা পয়সাও তবিলে ঢোকার আশা নেই—সে চেষ্টা করতে গেলে জেলে ঢোকার সম্ভাবনাই উনিশ আনা!

দিন তুইতিন চুপচাপ কাটিয়ে কানাই হাঁফিয়ে ওঠে। কাজে থাকলে আয় হোক না হোক—একরকম। নেশার ঝোঁক যেন। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলে আর উপায় নেই। হাজার চিন্তা। যে চিন্তার অর্থ থাকলেও অর্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সারাদিনের বাধ্যতা-মূলক অবসর যে ভাবেই হোক কাজে লাগাতে হবে। অন্য কোন কাজ খুঁজবে। একূল ভেঙ্গেছে অন্য কূল সন্ধান করতে হবে। দিশাহারা হয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে সুমুখেই ঘুর্ণি। কোথায় কোন হাওড়ে তলিয়ে যেতে হবে কে জানে।

এরই মধ্যে একদিন ব্যারাকপুর আর টিটাগড়ের মাঝখানে বয়মশুদ্ধ ধরা পড়ে গেল সে।

বয়মের লজেন্সকটা সম্বল করেই লাইনে বেরুল কানাই। প্রথমেই দমদমা। তিনদিনে কিছুই বদলায় নি পৃথিবীর। কালিঝুলি মাখা পরিচিত শ্রমিকদের তুচারজনের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল কেউ একবার ওর অনুপস্থিতির কারণটাও জিগেস করল না। তাহলে পরিচিত অপরিচিত সবাই জানে না খবরটা! বেশ খানিকটা স্বস্তিবোধ করে সে।

হঠাৎ ওভারব্রীজের তলায় দেখা নাটু আর হাবলার সঙ্গে। সাজাপানের পসরা আর বাদাম ভাজার দোকান গলায় ঝুলিয়ে

দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। ওকে দেখেই তুজনে একযোগে চেঁচিয়ে উঠল—শালা ফোর টুয়েন্টি আয়া রে-এ-এ।

পেটের সঙ্গে বাদামের চুবড়িটা চেপে ধরে একপাক ঘুরে গেল হাবলা। ঘোরার সময় ডান হাতটা বাতাসে আন্দোলিত করতে ভুল হল না তার।

শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগল রে শালা ?

দেখতে দেখতে দলের সকলেই হাজির। কৌতূহল আর চাপা উত্তেজনা সবার মুখেই। তীর্থ প্রত্যাগতের কাছে যেন তারা অভিজ্ঞতার পাঠ নিতে হাজির হয়েছে। একের পর এক—তারপর শুধুই প্রশ্ন। উত্তর দেয় দিক না দিলেও ক্ষতি নেই যেন কারো।

করুণা বেকারী এসে উপস্থিত। বাঁ কাঁধের সঙ্গে পাঁউরুটির টিনটা মোটা পাড়ের দড়ি দিয়ে ঝোলান। ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ থেকে দড়িটা গলিয়ে নিয়ে ধুপ করে শানের প্লাটফর্মে টিনটি রেখে বসে পড়ে তার ওপর।

আরে শালা কান্থু যে—মোথরো কেমন লাগল পানেশ্বর ? ছেলেবেলায় দেশে-ঘরে তুপাঁচবার যাত্রা দেখার স্মৃতিকে সুযোগ পেলেই এভাবে ঝালিয়ে নেয় করুণা বেকারী।

কানাই ছটফট করে লাইনের খবর জানবার জন্যে। এত স্ফূর্তি যখন ফিরে এসেছে সবার মধ্যে খবর ভাল নিশ্চয়ই।

লাইনের খবর বল এবার। ভাল ?

মুহূর্তমধ্যে সবার মুখ থমথমে। হাল্কা হাসির রেশও আর একটু নেই কারো মুখে। আলগোছে গম্ভীর অভিব্যক্তিভরা দৃষ্টি তুলে পরস্পরের দিকে নিমেষে তাকিয়ে নেয় সবাই। কানাই অবাক হয় ওদের আকস্মিক পরিবর্তনে। কী যেন ঝড়ের সূচনা। কাল-বোশেখীর আগের গুমোট স্তব্ধতা। বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে ওর। বাঁহাত দিয়ে বুকের সঙ্গে বয়মটা একটু জোরেই চেপে ধরে।

ওদের মনের নাগাল পায় না কানাই। সবার বয়স যেন মুহূর্ত মধ্যে দু-তিন গুণ করে বেড়ে গেছে।

করুণা বেকারীই বলতে লাগল সব খবর।

ব্যারাকপুরে ক্যানভাসারদের মিটিং হয়ে গেছে। জবর মিটিং। লাইসেন্স দিতে হবে রেলে ক্যানভাস করবার আর নয় ত অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে রুজি-রোজগারের। ক্যানভাসারদেরও পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার আছে—তাদেরও হকহিস্যা আছে দুনিয়াদারীতে। দুনিয়ার জল হাওয়ায় মাটিতে। বনগাঁ, বেলেঘাটা, মেনলাইন—সব দিক থেকে মিছিল এসে মিলে গিছল ব্যারাকপুরের মাটিতে। সিপাহী যুদ্ধ নীল যুদ্ধের জন্মদানের গৌরবপূত মাটিতে। এবারের যুদ্ধের হাতিয়ার দুর্জয় শপথ আর ঐক্য—যার চেয়ে বড অস্ত্র বোধ হয় কোনদিনই মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে না। দেড় হাজার ক্যানভাসার—প্রত্যেকের নিজস্ব স্বর এবং ভঙ্গি আছে গাড়ীতে কাজ করার সময় সেদিন কিন্তু দত্তপুকুরের জগদীশ আর জগদ্দলের রমেশ সবারই একসুর একস্বর একভাষা। ব্যষ্টি এসে সমষ্টি গড়েনি আণবিক কেন্দ্রশক্তির দুর্ণিবার আকর্ষণেই বিচ্ছিন্ন শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যেন।

দারুণ একটা উত্তেজনা নিয়ে শিয়ালদায় ফিরল কানাই। ফিরে এল ঘুমন্ত মানুষের স্তূপের মধ্যে। এদের যদি সবাই একসঙ্গে জেগে ওঠে?

বড় ইচ্ছা হয় সবাইকে একসঙ্গে জাগিয়ে দিয়ে দেখতে। পারে না। অনেক ইচ্ছাই ত পূরণ হয় না জীবনে। ভয়ও হয়। ওরা জাগলেই ত কাজ চাইবে। কে থামাবে তখন।

আটক অজগরের মত ফুঁসছিল ইনজিনটা। আগড়পাড়া আর সোদপুরের মাঝখানে চাকার স্প্রিং খুলে দাঁড়িয়ে পড়ে গল গল করে

ধোঁয়া ছাড়ছিল। বারকয়েক কুৎসিত ভেঁপুর আওয়াজ করে বন্ধ করে দিয়েছে। বয়লারে আগুন আর জলের মাতামাতি বাইরে থেকেও শোনা যায়।

হট্টগোল করে প্যাসেঞ্জাররা। খিস্তি করে। তুচারজন ইনজিনের দিকে তেড়েও যায়।

যাত্রীদের পনের আনাই শ্রমিক! ময়লা মাথার উকুনের মত কিলবিল করে। নেমে পড়ে গাড়ী থেকে। ঘড়ির কাঁটা তর তর করে ধাপগুলো ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে—সূর্য্য ঠেলে উঠছে মাঠের ওপারের জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে।

হাঁটতে আরম্ভ করে প্রায় সবাই। সোদপুরে পৌছাতে পারলে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে একটা।

থেকে যায় কানাই-এর মত তুচারজন ক্যানভাসার। দিনটাই মাটি। সকালেই বাধা যখন তখন দিনের খবর জানাই হয়ে গেল।

সাতটা তেরোর গাড়ীখানা আগড়পাড়া থেকে আর এগুতে পারছে না। বাঁশী দিচ্ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই।

নতুন ইনজিন এসে গাড়ীখানা টেনে নিয়ে যখন গিয়ে টিটাগড় সাইডিংএ দাঁড়াল তখন এগারোটা বাজে প্রায়। তিন নম্বর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে।

কানাই নেমে পড়ল।

বিকল ইনজিনটাকে ক্রেনে করে টেনে নিয়ে গেছে। অতবড় লোহার দানবটাকে পুতুলের মত নাড়াচাড়া করল ক্রেনটা। শেষ কালে টেনে নিয়ে গেল হিড় হিড় করে। যেন পোষা কুকুরের সামনের পাতুটো উঁচু করে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

শক্তিটা কার? ক্রেন না ক্রেন চালকের? ঝুলকালী মাথা ছেঁড়াখোড়া পোষাক লিকলিকে লোকটা। কপাল কোঁচকান, গালটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে। পেশীর খাঁজে খাঁজে কী তুর্জয় শক্তি লোকটার!

এটা টানছে ওটা ঘুরুচ্ছে—কথা যেন কইতেই জানে না। মাঝে মাঝে পিছনের পকেট থেকে ভাতের হাঁড়িমোছা ন্যাতার মত ময়লা ন্যাকড়া বার করে কপালের ঘাম মুছছিল। ঘাড়ে থাবড়াচ্ছিল। তালধিড়িঙ্গি লম্বা দূর থেকে দেখলেই মনে হয় আকাশের গায়ে একখানা আস্ত কংকাল দাঁড় করান আছে বুঝি!

লেভেল ক্রসিংএর ধারে বাঁদিকের দোকানটায় গিয়ে বসল কানাই।

অন্য গাড়ী ধরতে ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই হয় না তার। বাধা যখন পড়েছে একবার সাবধান হওয়াই ভাল।

ঐ রকম একটা ক্রেন চালাতে পেত সে!

দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটা। হল না—এ জীবনে আর আশা নেই! কত কাজই করবার বাসনা জীবনে বারবার এসেছে, মিলিয়েও গেছে!

বসলেই মনের অসন্তুষ্টি আর বিষাদ জড় হয় এসে। ব্যস্ত হতে গিয়ে পর পর দুকাপ চা-ই খেল কেবল। নড়ল না একচুলও। এক সময় মনের অজ্ঞাতেই উঠে পড়ে।

শুধু শুধু সময় নষ্ট হল খানিকটা! যেন কত কাজ তার বাকী!

সামনেই বি. টি. রোড। রোদ পড়ে সরীসৃপের গায়ের মত চিকচিক করছে। গংগা খুব দূরে নয় শুনেছে কানাই—যায় নি কোনদিন। দুধারে বস্তী। খাপরার ছাউনী। আদিম গুহাশ্রয়ের চেয়েও অন্ধকার—স্যাঁতসেঁতে। রাস্তা থেকেই কেমন টকগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রাস্তাটা বেশ চওড়া। পথের দুধারে ডাষ্টবিন অনেক জায়গায় রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত চলে এসে পদচারী একেরও যাওয়া আসা দুরূহ করে তুলেছে। বস্তীর প্রতিটি দরজার সুমুখে ছাইভস্ম জঞ্জালের পাহাড় জমে আছে এক একটা। দুধারে বন সেগুনের সারি। বস্তীর উপরে অনেক কষ্টে মাথাতুলে হাঁফাচ্ছে। রুক্ষ পাতার মুখকালো ভ্যাংচানীতে বস্তীগুলোর দেওয়ালে ছোপ ছোপ অন্ধকার।

চারাবট গাছ তলাটা পরিষ্কার। চারিদিকে ইটসাজিয়ে বেদী মত

করা। কয়েকটা বিভিন্ন আকারের নুড়ীতে সিন্দূর লেপা। পোকায় খাওয়া শুকনো পাতার খসখসানী। খ্যার খ্যার শব্দ করে বাতাসের ঝাপটায় ড্রেন সাফাই নোংরার স্যাঁতান স্তূপে গিয়ে পড়ছে হয়ত। গাছটার আগায় লম্বা বাঁশ বাঁধা। মাথায় ছেঁড়া বিবর্ণ ন্যাকড়া ঝুলছে খানিকটা। হনুমানজীর নিশান। হাওয়ায় উড়ছে না, অবসন্নভাবে থর থর করে কাঁপছে শুধু।

কানাই দাঁড়াল। পকেট হাতড়াল একটা ফুটো পয়সার জন্য। পেল না। যে কটা মুদ্রা রয়েছে আনীর চেয়ে ছোট মুদ্রা নেই একটিও। পয়সা আর দেওয়া হল না। শুধুই প্রণাম করল একটা। প্রণাম করার সময় কোন কিছু প্রার্থনা করা হল না। কী চাইবে আর কী চাইবে না ঠিক করা যায় না এত কম সময়ের মধ্যে। মাথা তুলে পাথরগুলোর দিকে কী দেখবার প্রত্যাশায় তাকাল তা নিজেই জানে না। চোখে পড়ল একটা টিকটিকি একটা পাথরে বসে ল্যাজ নাড়াচ্ছে। পিঁপড়েটার ওপর তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ। আর একটু এগুলেই তার জিভের নাগালে এসে যাবে।

সুমুখেই বি. টি. রোড। ওপারে নতুন রাস্তা আরো চওড়া আরো উজ্জ্বল। দুপাশের গাছ বড় হয়ে উঠতে পারে নি। রোদের হল্কা সারা পথটাকে চষে বেড়াচ্ছে যেন। কোন একটা মিলের রেল লাইন এপারে। ষ্টেশন রোডটা রেললাইনটাকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে বি. টি. রোডে মিশে গেছে। লাইনের ধারের জরাজীর্ণ গুমটি ঘরটার ছায়ায় চট পেতে এক বুড়ো শুয়ে! এক মুখ খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। পাশেই একটা বাচ্চা চানা বাদাম বিক্রীর প্রত্যাশায় বসে আছে। হাসি পায় কানাইএর। ওর চেয়েও দুরবস্থার ব্যবসাদারও দুনিয়ায় আছে তা হলে?

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বুড়োর শিথিল ঠোঁট দুটো ভয়াবহভাবে কাঁপে! দাঁত নেই বোধ হয় একখানাও। হয়ত এককালে কাজ করত কোন কারখানায়। বুড়ো বয়েসে কাজ গেছে। কাজ গেছে

ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই। এতদিন বেঁচেছে জীবনকে ভোগ করার দুর্নিবার আকাংখায়, এখন বেঁচে আছে শুধু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য। তাই হয়ত ক্লান্তির অবসরে ঘুমিয়ে নেয়। ঘুমিয়ে নেয় ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নয় জাগ্রত চেতনার কাছ থেকে পালিয়ে থাকার জন্য। জাগলেই মৃত্যুর বিভীষিকা।

দুপয়সার ঝালছোলা কিনল কানাই। দুকাপ চা খেল ওখানে—ছোলা কটা খাবার পর খেলে কেমন হত। চুলোয় যাক গে। অত .হিসেব করে চলা যায় না। বসে বসে ছোলা কটা খেতে পারলে মন্দ হত না। পাশেই কামার শাল। রাস্তার উলটো পিঠে, রেল লাইনটার পূবে। কামার বুড়ো হাতুড়ী পিটছে। ওখানেই উঠল গিয়ে। বাঁহাত দিয়ে বুকের সঙ্গে লজেন্সের বয়মটা চাপা, মুঠোয় ঝালছোলার কাগজটা। ডান হাত দিয়ে একসঙ্গে গোটা কয়েক দানা তুলে নিয়ে একটা একটা করে গালে ফেলে দিয়ে দাঁতের চাপ দিচ্ছে —মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সেগুলো।

পুরু গোল কাঁচের চশমা বুড়োর চোখে। ডাঁটি নেই। দড়ি দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে গিঁট বাঁধা। একমুখ সাদা দাড়ি। মুখের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান শেয়ালের ল্যজের মত গোঁফ একজোড়া। প্রান্তদ্বয় ঝুলে পড়ে শ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসে কাঁপছে। কপাল ভর্তি বলিচিহ্ন, খাঁজে খাঁজে ঘাম টলটল করছে। গালের দুপাশ দিয়ে পায়ের কাছে টুপিয়ে পড়ছে। মাথাবাঁকা সাঁড়াশী দিয়ে গনগনে লোহার টুকরোটা নেহাইএ চাপিয়ে নিপুণ হাতে হাতুড়ী চালিয়ে যাচ্ছে—ক্রমে ক্রমে কিছু যেন রূপ নিচ্ছে একটা। হাতের আলগা পেশী বজ্রের মত কঠোর হয়েও ঝুলঝুলে চামড়াকে টেনে ধরতে পারে নি। বগলের কাছে ঝুলছে। ছেঁড়া কাপড়ের মত ঝুলঝুল করছে।

হাতুড়ীটা পাশে নামিয়ে হাপরের জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে খানিক ঠাণ্ডা হয়ে আসা লোহার পাতটা গুঁজে দিয়ে দড়িতে গোটা দুই টান দিল বুড়ো। বাঁহাত থেকে খেজুর পাতার ঝাড়ন দিয়ে ছাই

ঝেড়ে ফেলল। হাপর টানতে টানতেই এবার কানাইএর দিকে তাকাল সে। চশমার কাঁচ দুটো নাকের ডগার দুপাশে থাকায় মাথাটা খানিকটা পিছনে হেলিয়ে দিতে হল কানাইকে দেখতে। ডান হাতের তালু দিয়ে গোঁফ জোড়াটা মুছে নিল ওরই মধ্যে। ঘোলাটে চোখ। বিশ্রীভাবে বড় আর বিবর্ণ দেখায় ময়লা পুরু লেন্সের মধ্যে দিয়ে। মৃতের চোখ যেন। প্রকাণ্ড, বীভৎস।

গালটা হাঁ হয়ে গেছে বেশ খানিকটা। গোঁফদাড়ির ঝোপ ডিঙ্গিয়ে বাইরে বেরুতে পারে নি সবটুকু। মুখের মধ্যে পক্ষাঘাত-গ্রস্থ অঙ্গের মত নোংরা বিবর্ণ জিভটা সুমুখের একমাত্র অবশিষ্ট দাঁতের আড়ালে দোল খায় যেন।

বোস। কি কাজ—হাতা না খুন্তী।

হাত তার হাপরের তালে তালে ওঠে নামে ঠিকই। লাল টকটকে ছাই উড়ে নিভে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

না কাজ নেই কিছু—আপনার কাজ দেখছি।

অ—তা জুত করে বোস। তক্তাটা টেনে নাও।

হাপরে মন দেয় বৃদ্ধ সতীশ। খেজুর পাতার ঝাড়নটা দিয়ে আশপাশে ছড়ানো কয়লাগুলো আগুনের চারিধারে সাজিয়ে দেয়। হাপরের দড়ি তখনও উঠছে আর নামছে। জঞ্জালগুলো ঝাড়ুর আঘাতে আগুনে পড়েই আগুনের ফুলঝুরী ছোড়ে, শব্দ করে চড়বড় করে। বুড়োর হাতের ওপর সাদা সাদা ছাই এসে পড়ে। ফুটো হাপরের মত ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে বার কয়েক ফুঁ দিয়ে সেগুলো উড়িয়ে দেয়। আবার মাথাটা পিছনে ঝুলিয়ে দিয়ে চশমার কাচের সাহায্যে কানাইএর দিকে তাকায়।

দাঁড়িয়ে কেন—বোস। চারকোণা কাঠের একটা খাদি এগিয়ে দেয়। বসে কানাই। বুড়োর কাজ দেখতে বেশ লাগছে।

হাপর চলছে, হাতুড়ী পড়ছে, নেহাই কাঁপছে। উত্তপ্ত লোহা থেকে মরচেগুলো উল্কার মত ছুটছে চারিদিকে।

হাপরের হাওয়ায় আগুন ফুঁসছে। বুড়ো জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে সেই আগুনের হলকার দিকে। একধারে কুচো কয়লার স্তূপ—ডান হাতের পাশেই গলা পর্য্যন্ত পোঁতা জলের ম্যাচলাটা। সব কাজ চলে ওতে। পান দেওয়া, হাপরের আঁচের জায়গাটুকু ন্যাপা আবার তামাক সেজে সতীশ হাতটাও ধুয়ে নেয় ঐ জলেই।

বাড়ী কোনখানডায়? লোহার টুক্‌বোটা আগুনের মধ্যে ঠিক করে ঢুকিয়ে দিয়ে হাপরটায় পর পর কয়েকটা টান দিল সতীশ। কানাই উত্তর দিল একটা। শোনবার কথা বোধহয় আর মনেই নেই সতীশের। লোহাটাকে আগুন থেকে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে বার করে নেহাইএর ওপর রেখে পর পর কয়েকটা মোক্ষম ঘা দিল সতীশ।

এঁ্যা—কী বললে? লোহাটা আগুনের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে তাকাল ওর দিকে। চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে আবার সেই মৃতের দৃষ্টি।

থাকি শিয়ালদায়। বাড়ী পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে! উদ্বাস্তু! তা এখেনে কী মনে করে?

গর্জনই করে উঠেছিল সতীশ কিন্তু শেষের দিকটায় গলায় সর্দি জড়িয়ে গেল—কোন মুমূর্ষু পশুর গোংরাণীর মত শোনাল স্বরটা। কানাইএর আপাদমস্তক এক নজরে পরীক্ষা করল সতীশ। যেন সব খবর ওর দেহেই উৎকীর্ণ আছে।

শিশিতে কী—লবঞ্চুস? লবঞ্চুস বেচা হয় বুঝি?

লবঞ্চুস শুনলে হাসি পায় কানায়ের।

ঘাড় নেড়ে অনুমানকে সমর্থন জানায় কানাই। মরিয়া হয়ে বলে, কাজ-কর্ম ত কিছু জোগাড় করা যায় না, যা হয় করতে হবে ত একটা।

সতীশের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। চোখঃ বিরক্তিভরে নামিয়ে নিয়ে আরো দ্রুত হাপরের দড়িতে টান দিতে লাগে। একটা রণক্লান্ত হিংস্র পশু হাঁপাচ্ছে যেন।

নামটা কী যেন। গোয়েন্দার মত কানাইএর মনের ভিতর চলে যেতে চায় সতীশ। সতর্ক।

কানাই কী ভাবছিল। শুনতে পায় না। লজ্জিত হয় একটু।

কী বললেন ?

নাম—নাম ! বলি নামটা কী তোমার ?

কানাই।

সামলাও ঠ্যালা ! নাম জিগ্যেস করেও ঝকমারী। মা যশোদার কানাই এলেন—একডাকে ত্রিভুবন চিনে নেবে ! নেকাপড়া হয়েচে কদ্দুর ? নামের সঙ্গে পত্বুবী না বললে কী নাম বলা হয় ? পত্বুবীটা কী ?

দাস।

সশব্দে হেসে গড়িয়ে পড়ে বুড়ো সতীশ কর্মকার।

সামলাও ঠ্যালা ! দাস ! রুইদাস হরিদাস রামদাস কোন দাসে বাধা নেই। যখন যেখানে যেটা খাটে কী বল ? বাঙ্গালদের কী সোজা পত্বুবা এ্যাট্টাও থাকতে নেই !

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কানাই।

আমরা হেলো দাস। বলে কোনরকমে।

হেলো দাস—যারা হাল চালায় ? হাল থেকে হেলো—এই যেমন আমি কামারে বাগ। আবার সশব্দ হাসি। বিদ্রূপ ক-ঠোব সে হাসি।

বাবা !

থতমত খেয়ে থেমে যায় সতীশ। থতমত খায় কানাইও।

ওর সুমুখ দিয়েই এক হাতে চায়ের গেলাস আর একহাতে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে এসে ঢুকল মেয়েটা।

অশ্বস্তি বোধ করে কানাই। সতীশ অপ্রতিভ।

চা আনলি ? রাখ। লবঞ্চুস খাবি ?

হাসির একটা রেখা পড়ে মুখে। বাপের কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে ?

যেন এক-ঘর লোক রয়েছে !

ঝগড়া ! তুই ত আমায় রাতদিন কেবল ঝগড়া করতেই দেখিস। বল তো—কী যেন নামটা—নিতাই—বল ত নিতাই ঝগড়া করছিলাম ?

কানাই সতীশের এই বেসামাল অবস্থাটায় কৌতুক বোধ করছিল। হাসল সে। বলল, না না ঝগড়া কোতায়। তবে—

তবে কী আবার ! ঝগড়া নয়—ব্যস—এক কতায় উত্তর। তা না আবার লেজুড় জুড়ে দেয়া হল, তবে ! বোস বোস—চা থাকে ত ওকেও এট্টু এনে দেত বাদলী।

হাসিমুখে বাদলী কানাইয়ের দিকে তাকায়। বাচাল শিশুর মা যেন সে। চোখের ভাষায় কানাইকে যেন তার বাপের গুণপনা ব্যাখ্যা করে দেয়। চলে যাবার সময় বলে, বসুন চা আনি, বাবার কথাই ওরকম। চিরটা কাল গেল একভাবে !

মেয়ে চলে যেতেই বাঙ্গালবিদ্বেষী সতীশ নরম হয়ে যায় কেঁচোর মত। কানাইকেই সাক্ষ্য মানে সে, বল ত নিতাই—

নিতাই নয়, আমার নাম কানাই।

ও, কানাই ?—ও একই কথা। তোমার কী মনে হয়—আমি মেয়েকে ভয় করি ? একটুও নয়। একগাল হেসে ঘট্ ঘট্ করে ঘাড় নাড়ে সতীশ। বলে চলে ফের ওকে কী আমি চোখ গরম করে কতা বলতে পারি না ভেবেছ ? খুব পারি। তবে বলি না কেন—না, মা মরা মেয়ে। হয়ত মনে দুখ্যু পাবে। অথচ বারো শালায় যেখানে সেখানে বলে বেড়ায় আমি নাকি মেয়ের ভয়ে জুজু। শালারা ! আমার সামনে একদিন বলল বুঝি, এই বাঁকসাঁড়াশী দে শালাদের জিব টেনে বের করব তবে না আমি সতীশ বাগ ! বলি ব্যাটারা দুর্ণাম যে রটিয়ে বেড়াস্, তোরা সতীশ বাগকে দেখলিই বা কবে আর চিনলিই বা কতটুকু ! ওর মা থাকত—দেখিয়ে দিতাম শাসন কাকে বলে ! ছেলে মেয়ে শাসন করতে হয় কী করে শালারা

যেন শিখে যায় আমার কাছে। তবে যদি বল করি না কেন—মা মা-মরা। এককালে আমার চোখ রাঙ্গানীতে ফলবাজারের তা-বড় তা-বড় গুণ্ডারা পর্যন্ত পেচ্ছাপ করে ফেলত! ওকে আমি চোখ রাঙ্গালে মিষ্টি কথা বলবার মানুষ কই? ভাবতে হয় সবদিক। মেয়েকে ভয় করি! শালারা! মেয়ের গব্যধারিণীকেই বড় কোনদিন ডরালাম। হ্যাঁ তবে·মেয়ে আমার--

থাক খুব হয়েচে। আমি সব শুনিচি। নিন্দের রামায়ণ মহাভারত গেয়ে আর সামনে সুখ্যেত করতে হবে না। মুখচোখে হাসি ভরিয়ে নিয়ে এসে ঢোকে বাদলী। হাতের গ্লাসে চা। কানাইয়ের সুমুখে চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে দেয়। বাবার দিকে চেয়ে তখনও মৃদু হাসছে সে।

কানাই ওর মুখটা এক লহমায় দেখে নেয়। খোলার চালের ফাঁক দিয়ে একটুকরো মুগা রোদ বাদলীর গালে আর একটুকরো পড়েছে ওর কালো চুলের ওপর ঝাঁপিয়ে।

কী গো নিতাই, তুমিই বল, নিন্দে করছিলাম আমি? যা বলব বাবা, সামনাসামনিই বলব। কী গো এখন যে আর কথা নেই?

না না নিন্দে আর কী। তবে—

আবার, তবে? নিন্দে নয় ব্যস্! আবার, তবে, কিসের? বলি কাজকম্ম কিছু আছে? না কী? এমনিই লবঙ্গুসের শিশি হাতে টহল দিয়ে বেড়ান হয়? কাজকম্ম থাকলে আর করবে কখন? একলা মানুষ আমি—হাতে কত কাজ—তোমার মত বসে বসে গালগপ্প করলে ত আর আমার চলবে না। নাও বাঁ হাত দিয়ে হাপরটায় গোটা দুই টান দে দাও দেখি। বঁটিটা এক মত্তকে করে নিই। জোয়ান মানুষ হাত কোলে করে বসে থাকবে কেন।

কানাই হাপরটায় গোটা দুই টান দিতে না দিতে বাদলী এসে ওর হাত থেকে দড়িটা নিয়ে টানতে থাকে। বলে, কদ্দিন ধরে বলচি লোক রাখ একজন। তা ত হবে না। পথের লোক তোমার

হাপর টানতে আসবে কোন গরজে ? ঐ এক বংশীর কথা তুলবে কিছু বলতে গেলেই—তুনিয়া শুদ্ধ যেন বংশীর ছাঁচে তৈরী। নিত্যি হাতের যন্তন্না কোমর কট্‌কট্‌—এগুলোও এট্টু দমন থাকে হাতের খানিক আসান পেলে।

তোর আর কী। তুনিয়ায় কী আর মানুষ আছে—সব শালা বেইমান। যার ওপর ভরসা করবি সেই গলার নলীতে ছুরী বসাবে। হাত-পা থাকলেই কী মানুষ হয়! দেড়টাকা রোজ দোব তুই এট্টা আস্ত মানুষ জোগাড় কর দিকিনি।

একটু থেমে মেয়ের নিরবতা থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে নেয় সতীশ। বলতে থাকে, একজন হাতের দোসর থাকলে আয় পত্তরও বাড়ে—চিরটা কাল ত এট্টা তুটো কারিগর খাটিয়েছি এই এখানে বসেই! তাছাড়া সেই ল্যাম্পোর কাজটা—ওটাও সে বানচোতের সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নামে গেল। খাটনী কম—তুটো পয়সার মুখ দেখা যেত।

কলকেয় পর পর তুটো ফুঁ দেয়। একঝাঁক ছাইয়ের টুকরো উড়ে আগুন গন গন করে। হুঁকায় মন দেয় সে। চিন্তার পরিধিকে ছোট করে তাড়াতাড়ি কেন্দ্রের কাছে নিয়ে আসবার সেরা ওষুধ। গল গল করে ধোঁয়া বেরিয়ে ওর ঘোলা চোখ তুটোকে আরো ঘোলা করে ফেলে।

আমায় রাখবেন—দেড়টাকা রোজ ওতেই চলবে আমার। কাজ দেখে পয়সা। মরিয়া হয়ে বলল কানাই। বাচনভঙ্গিটা ক্যানভাসার-এর মত। যেন গাড়ীতে লেকচার দিচ্ছে—আগে খেয়ে পরে দাম! কানাইএর মুখ থেকে কথা কটা শেষ হবার পর সতীশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ওর মুখের দিকে। ঠোঁটের ওপর গোঁফটা থরথর করে কাঁপে। দেখতে দেখতে চোখ তুটো ভাঁটার মত জ্বলে ওঠে।

ও আমি আগেই বুঝেছি! বয়েসটা ত কম হল না! ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে এসে বসে এখন কাজের কথাটা বাগ মত পেড়ে বসেছে!

না—ও সব চালাকী এখানে চলবে না—ন্যাড়া বার বার বেলতলায় যায় না—ভালয় ভালয় সরে পড় বলছি !

কানাই থতমত খেয়ে যায়। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় তার অপমানের তীব্রতায়। বসেই থাকে তবু। মাথা তুলতে পারে না বাদলীর চোখোচোখী হয়ে যাবার ভয়ে। মেয়েমানুষের সুমুখে অপমানিত হতে যে এত খারাপ লাগে কে জানতো এর আগে ! মনে হয় একছুটে যদি এদের কাছ ছাড়িয়ে এমন কী নিজের থেকেও অনেক দূরে চলে যাওয়া যেত ! কিন্তু নড়ে না একটুও। পাথর হয়ে গেছে যেন। সাঁপি এঁটে ওকে যেন মাটীর সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে।

কথা বলতে পারে না বাদলীও। তার যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে বাপের জন্য ! মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে লজ্জায়।

কী হল—উঠলে না ? বংশীধরকে চেন—বংশীধর—তোমাদের দেশের বংশীধর। কে হয় সে ? ঘৃণায় আরো কুৎসিত হয়ে ওঠে সতীশের ঘোলা চোখদুটো।

অবাক হয়ে কানাই তাকায় ওর দিকে। প্রথমটায় বুঝতেই পারে না প্রশ্নটা তাকেই করা হয়েছে কী না। সতীশ ওর দিকেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। পাকা ভ্রূ নাচছে নিষ্ঠুর উল্লাসে।

বংশীধর—কে বংশীধর ? কানাইএর মনের ওপর দিয়ে একরাশ নামের ঝড় বহে যায়। না, কোন বংশীধর নেই তার মধ্যে।

বলে, বংশীধর কে—চিনি না।

ঘাড়টা বাঁ দিকে বারকয়েক নেড়ে দেয় সতীশ।

তা ত চিনবেই না। চিনলে আর ভিড়বে কী করে ?

সতীশ এবার তাকায় মেয়ের দিকে। ব্যথায় করুণ। বৈকালী রোদের পরিমিত আলোয় চোখদুটো তার ঊষাকালের নক্ষত্রের মতই নিষ্প্রভ।

আচ্ছা ফ্যাসাদ যাহোক ! না, সতীশ আর দুর্বল হবে না।

বংশীকে যে ভুল করেছে তার আর পুনরাবৃত্তি সে হতে দেবে না। ওসব জারিজুরী আর খাটছে না। যা বলবার বলে দেবে সে নিজে—মেয়েকে সে ভয় করে না কী!

ইতিমধ্যে বাদলী ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। সতীশের গলার জোর যেটুকু অভিভূত হয়ে পড়েছিল সেটুকু আবার তাজা হয়।

যাও—নিকালো হিঁয়াসে! নেহি মাংতা!

কানাই আর বসে না। লজেন্সের বয়েমটা নিয়ে উঠে কামার-শালা থেকে বেরিয়ে যায়। দুচোখ অপমানে জ্বালা করে। কান পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে ক্ষোভে আর দুঃখে। শুধু শুধু অপমান। এ যেন তার কপালের লেখা—সতীশ উপলক্ষ্য। নাঃ সতীশকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।

সতীশকে দোষ দেবার মত জোর কিছুতেই যেন পায় না কানাই। সতীশকে দোষী করবার পক্ষে যুক্তিগুলো কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। কিন্তু কে এই বংশীধর? কী এমন করেছে সে?

পর পর প্রশ্নগুলো দিয়ে নিজেকেই জবাবদিহি করে সে। কিন্তু কোন উত্তরই পায় না!

বাঁ দিকে ঘুরেই সুমুখে ষ্টেশনে যাবার রাস্তা। মোড়টা ঘুরে কয়েক পা গিয়েই দাঁড়াতে হয়।

একটু দাঁড়াবেন?

পাশের দরজার দিকে তাকাতে হয়। বাদলী। কানের পাশে কয়েকগুছি চুল ওড়ে বাতাসে। মেঘলা বিকালের দিঘির মত ব্যথাতুর চোখদুটো তুলে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

আমায় বলছেন? কে যেন কানা র গলাটা চেপে ধরেছিল। গলাটা ঝেড়ে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করে সে।

হাঁ—একটু শুনুন। মেয়েটা আর চোখ তোলে না। বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা চেপে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঠটা খুঁটেই চলেছে। কানাই দু একপা অগ্রসর হয় ওর দিকে।

বাবার কথায় কিছু মনে করবেন না। মাথার ঠিক নেই, কাকে যে কখন কী বলেন তার হিসেব নিজেই রাখতে পারেন না। পরে আবার ঐ নিয়েও ছুখ্যুও করেন। একটু থেমে বলল, তাছাড়া বয়েস বাড়লে সবাই একটু খিটখিটে হয়।

না মনে আর কী করব। খামোকা যা-নয়-তাই গুচ্ছোরখানেক শুনলাম। ওতে অবিশ্যি আমার যায় আসে না কিছু। ওসব আমার গা সহা হয়ে গেছে। আর মোফতায় ছুকথা শুনিয়ে দেবার মওকা পেলে ছাড়ে কে বলুন।

এবার সোজাসুজি কানায়ের মুখের ওপর তাকাল বাদলী। ইচ্ছা হল বলে, যেমন সুযোগ আপাততঃ আপনি পেয়েছেন

কানায়ের চোখে ব্যথা আর পুঞ্জিভূত ঘৃণা। ব্যথা অহেতুব অপমানে আর ঘৃণা আপন অবস্থার নিষ্ঠুর নিরূপায়তার প্রতি। কথাকটা বেশ আবেগভরেই বলল সে।

বলার যা ছিল হয়ত শেষ হয়নি। তবু এবার বলতে হবে। কিন্তু কেন যেন তবুও দাঁড়িয়ে রইল সে। নড়তে পারল না।

বলা ত হল—কিছুই ত শোনা হয় নি। তাই দাঁড়াল বুঝি। বাদলী তার অপমানের তীব্রতাটা উপলব্ধি করেছে। তাতে যেন আরও অসহায় বোধ হয় নিজেকে। ও বলুক আরো ছুটো সান্ত্বনার কথা। তাতে নিজের ব্যথার বোঝা আরো ভারী হবে সত্য—আরাম নেই কিন্তু আনন্দ আছে তাতে।

চুপ করে রইল বাদলী। ঠোঁঠ ছুটো সব শাসন উপেক্ষা করেও একবার কেঁপে উঠল লজ্জায় অনুতাপে আর বাপের ওপর কানায়ের ওপর অভিমানে! কানাইকে সে কী করে বোঝাবে যে কয়েক মিনিটের আলাপে সতীশ সম্বন্ধে যে ধারণা সে করে নিয়েছে তার আগাগোড়াই ভ্রান্তি। অজস্র কাঁটার বেষ্টনে একটি গোলাপশুচি মনও আছে তার! লোহার সঙ্গে লড়াই করে করে এখনও বাৎসল্য বিদগ্ধ মনটা তাজা আছে প্রভাতী রোদের মত।

কাজ কী আপনি সত্যিই করবেন। এ কাজ কত কষ্টের। শেষ পর্য্যন্ত কোনরকমে বলে বাদলী। আর কিছু বলবার খুঁজে পায় না।

কষ্টের হলেও কাজ ত বটে। আরাম কী কষ্ট তাত ভাববার সময় পাইনি। কিন্তু এখন আর সে কথায় লাভ কী। অভিমান ক্ষুব্ধ কানাইও।

কাল থেকেই কাজে আসুন আপনি। দেখলেন ত বাবার অবস্থা —একলা আর পারছেন না। বলুন আসবেন! যেন সে তার বাপের হয়ে ক্ষমা চাইছে কানাইএর কাছে। মিনতি ঝরে পড়ে তার কথায়।

ব্যঙ্গ হাসিতে কানাইএর মুখ ভরে যায়। লোক না হলে কারবার ডকে উঠবে অথচ ঝাঁঝ আছে আঠারো আনা!

কিন্তু আপনার বাবা ত আবার—কী যেন বলতে গিয়েও সামলে নেয় কানাই। সবাই সুমতি নয়!

না না সে সব ভাবনা আপনার ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব'খন। আসবেন ত? কেমন যেন ভিজে ভিজে স্বর বাদলীর।

আপত্তি করতে পারে না কানাই! সে যেন পালাতে চায়। কোনরকমে বলে, আসব। কিন্তু—

কিন্তু যে কী তা নিজে জানে কানাই বোঝাতে পারে না। অপমানটুকু সে ভুলতে পারে নি আবার সে কথা তুলে বাদলীকে ব্যথা দেবার মত নিষ্ঠুরতায় সায়ও দিতে পারে না। তাছাড়া তার নিজের গরজও কম নয়—কাজ পাওয়ার ব্যাপার।

বলুন। বাকীটুকু শুনতে চায় বাদলী। তার মধ্যে আর কোন লজ্জা বা জড়তা নেই। সব কিছুর মুখোমুখী দাঁড়াতে সে তৈরী। পক্ষ সমর্থনে গলা তার একটুও কাঁপবে না। সব অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বাবাকে রাখবে স্মিতশুভ্র শুচিতায় ঢেকে।

বাইরে থেকে মনের ভিতরকার রূপটার বিকৃতিকেই আসল বলে ধারণা কেন করবে পাঁচজনে। বাপের ওপর সাধারণের এ অবিচার আর সে হতে দেবে না। সমগ্র সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে পুরা মানুষটাকেই দেখুক।

আপনার বাবা আমায় রাখবেন কেন। তিনি ত আমাদের চেনেন। কানাই খোঁচাটা না দিয়ে পারে না। চমৎকার প্রতিশোধ নেওয়া হল বলে স্ফুর্তি হয়। আনন্দও লাগে বেশ। নারীকে বেদনা দিতে পারার আনন্দ।

বাদলা আর একটু নরম হলে হয়—মনের ঝাল আশা মিটিয়ে ঝেড়ে নেবে সে। তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে কানাই। সতীশের কাছে পাওয়া আঘাত সুদে আসলে ফেরত দেবে! এমনই ভাবখানা।

আপনি ত এক কথায় আমার বাবাকে চিনে নিয়েছেন দেখছি।

স্বরটা ব্যঙ্গের।

পুরো না হোক খানিকটা ত বটে।

জোর দিয়ে বলতে চাইলেও তেমন যেন জোর পায় না কানাই।

আমার বাবাও আপনাকে আপনার মতই চিনেছে! সে কথা থাক—বাজে কথায় লাভ নেই কিছু। আপনি যদি কাজ করতে রাজী থাকেন তবে কাল থেকেই আসুন। যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই।

দৃঢ়তা ফিরে পায় বাদলী। আত্মপ্রত্যয়ের পানে ঠনঠন করে তার প্রতিটি কথা বাজে যেন।

রোজ দেবেন কত? কানাই নরম হয়ে যায় বাদলীর দৃঢ়তায়। উমেদারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে আসে সে। তবুও দরাদরির ঝোঁকটা সামলাতে পারে না।

দেড় টাকা। এখন কাজকম্ম করুন লাভ পত্তর বাড়াতে পারলে আপনার মজুরীও বাড়ান হবে বৈকী। বাদলীর স্বর বেশ ঝরঝরে।

সতীশও দেড় টাকাই বলেছিল বটে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মাসে তাহলে পঁয়তাল্লিশ। রাজী হয়ে যায় কানাই। রোজ রোজ দেড়টা টাকার ব্যবস্থা হল ত—দেখাই যাক না শেষপর্য্যন্ত। দেড় টাকা—দিন পোহালেই দেড় টাকা—বাঁধাধরা—এই অনেক। যা চেয়েছিল তার চেয়ে বেশী হয়ত।

টিটাগড় ষ্টেশনে দুনম্বর প্লাটফরমের পুলের ওপর বসে সারা-দিনের কথা ভাবছিল কানাই। ছেঁড়াছেঁড়া ঘটনা আর ছোটখাটো দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা ত বটেই ট্রেণ বিকল হওয়া থেকে সতীশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি—দুর্ঘটনা ছাড়া কী! ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা থেকে ঝাঁক ঝাঁক বিভিন্ন ধরণের শব্দ ভেসে আসে। কারখানার একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা বাতি জ্বলছে নিবছে আবার জ্বলছে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। বড় জোনাকী যেন একটা। গাছের পাতায় বসে জ্বলছে আর নিভছে। ঝিঁঝি ডেকে উঠল ব্রীজের তক্তার ফাঁক থেকে। রেল লাইনের ধারে নয়ানজুলিতে একটা শিয়াল বার দুই ডেকে থেমে গেল। মাথার ওপর উদার আকাশ। তারার চুমকী দেওয়া চন্দ্রাতপ যেন। রায়বাবুদের বাড়ীর যাত্রা গানের সময় যে চাঁদোয়াটা টাঙান হত সেটা ছিল লাল। লাল শালুর চন্দ্রাতপ। হ্যাজাক আর ডেলাইটের আলো পড়ে আগুনের মত দেখাত। পাশে বাঁশবনের অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যেত সেই লাল আভা। তার ওপারে মিত্তিরদের খিড়কী পুকুর পাড়ের কলার ঝোপ থেকে দু একটা তোক্ষক ডেকে উঠত—বাদুড় বসত কচি কলার রস খেতে। দু একখানা ছেঁড়া মেঘ উড়ে চলছে আকাশে ঠিক কানাইএর মত। কানাই যেমন আবছা আলো আধারীতে সেই বাঁশবনের মধ্যেকার সরু হাঁটা পথটা দিয়ে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে আসত। মুকুন্দ ঘরামী তার ঢোলে হয়ত দুচারটে চাঁটি দিয়ে বসেছে ইতিমধ্যে। হরিপদ তার বেহালাটার কান মলছে সুর বাঁধতে, করতাল পড়ছে

ঝমরঝম। কারখানার মধ্য থেকে করতালের আওয়াজ বেরোয় মাঝে মাঝে। কাল থেকে সেও লোহা পেটাবে। খুশীতে হালকা হয়ে যায় দেহটা। হাওয়ার সঙ্গে মনটাও রিণরিণ করে মৃদু আওয়াজ তুলে খেলা করে।

একঝাঁক পোকা উড়ছে পুল থেকে নামবার পথের ওপর বাতিটাকে ঘিরে। মাথা কুটছে কাচের আবরণে বারবার।

পরপর কখানা গাড়ী অবিশ্বাস্য ভিড় নিয়ে কলকাতার দিকে চলে। কানাই দেখল। বুঝল না। মস্তিষ্ক ও ব্যাপারে নির্বিকার।

সতীশ লোক কেমন কে জানে। প্রথমে ত বেশ ভদ্র বলেই মনে হয়েছিল। কোথা দিয়ে সে ধারণা ওলট পালট হয়ে গেল পরমুহূর্তেই! ডেকে বসাল চা খাওয়াল আবার কলকাতার ষাঁড়ের মত হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন?

বংশী ওর কী করছে কে জানে কিন্তু তা বলে দুনিয়াশুদ্ধু তার জন্যে দায়ী হবে না কী! বুড়ো হয়েছে—মেজাজ কত ঠাণ্ডা হবে এখন! মেয়েটি তবু একরকম। দেমাক নেই অত। তবে নামটা —বাদলী। আহা কী নামের ঘটা—এর চেয়ে গাড়ু, বদনা, তক্তাপোষ যা হয় একটা নাম রাখলেই হয়! রূপেরই বা কী বহর! ওর চেয়ে সুন্দর হাজার গণ্ডা মেয়ে রোজ পথে ঘাটে দেখছে কানাই। বয়েস কত কে জানে তবে সুমতির চেয়ে যে অনেক বড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাল্‌কা স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ ডুবোচরে আটকে যায় কানাই। সুমতি কোথায় এখন? কে জানে। কেউ জানে না সুমতি কোথায়। সেদিন দমদমায় রিক্‌সা করে বর্ডার শ্লিপের দাঁত উঁচু দালালটার সঙ্গে সেই যে যেতে দেখেছিল তারপর আর কোনদিন দেখে নি ওকে। কতদিন ওর বাপমায়ের সুমুখ দিয়ে যাবার সময় ওদের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছে কানাই। কেমন আছে ওরা জিগ্যেস করেছে। রমলাকে দেখেছেন কাকী—সুমতির মাকে জিগ্যেস করল হয়ত। পাশে

বসে শরৎ বিশ্বাস দুয়েকবার পিটপিট করে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কী হতে পারত অথচ হল না তাই ভাবে হয়ত।

রমলার খোঁজটুকু নিয়েই চলে যেতে হয় কানাইয়ের। যার খোঁজে যাওয়া সেই সুমতির কোন খবরই পায় না ওদের কাছ থেকে। ওরা নিজেরা যদি না বলে খুঁচিয়ে ত আর জিগ্যেস করা যায় না। ভাল দেখায় না। কিন্তু কতদিন এই নিয়ে খুঁত খুঁত করেছে সে। হয়ত সে যা ভাবছে তা নয়। রমলা হয়ত কোন নারীমঙ্গল সমিতিতে কাজ শেখে কিংবা—কত রকমের কাজই ত আছে হাসপাতালে, তেমন কোন কাজ হয়ত জুটিয়ে নিয়েছে। হয়ত কোন আত্মীয় ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে। আত্মীয়ের কথা মনে হতে ঠোঁটের কোনে একচিলতে ম্লান হাসি তৃতীয়ার বিমর্ষ চাঁদের মত উঁকি দেয়—সোমত্ত মেয়েদের কোনদিনই হিতাকাংখী দূর-আত্মীয়ের অভাব হয় না। আপনা থেকে জুটে যায় —গ্রীষ্মকালের কলেরা বসন্তের মতই।

হালছাড়া অলস অবসরের চিন্তা ওকে কোথা দিয়ে যে কোথায় নিয়ে যায় বুঝতে পারে না কানাই। সুমতি আর বাদলী—তুলনা করতে বসে যায়। টানটা সুমতির দিকেই বেশী। যৌবনের প্রথম দিনগুলো যে কন্যা রাঙ্গিয়ে দিয়েছে, যে ওর যৌবনকে সহর্ষ অনুমোদন জানিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, তার অমঙ্গলের কোন কথাই কানাই ভাবতে পারে না। সুমতির কথা, এতদিন শিয়ালদায় পাশাপাশিই আছে বলতে গেলে, এমন করে একটা দিনও ভাবে নি। আজ যেন বাদলী ওর ঘাড় ধরে ভাবাতে আরম্ভ করেছে নতুনভাবে, পর্যালোচনা করতে বাধ্য করিয়েছে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে।

মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে কখন এক সময় গাড়ীতে উঠে পড়েছে খেয়াল নেই কানাইয়ের। মনের অন্ধকার গহনে হয়ত একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দিয়েছিল শিয়ালদায় ফিরে সুমতির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। মনে মনে যে সব অমঙ্গল

সম্ভাবনার কথা ভেবেছে অমূলক প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু গাড়ীতে ঢুকবার আগেই—ফুটবোর্ডে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যকার ক্যানভাসারটি বেরিয়ে পড়ে। টকমিষ্টি লজেন্সের গুণ ব্যাখ্যা করতে করতে সম্ভাব্য খদ্দেরদের জানিয়ে দিতে ভুল হয় না যে ঐ মহামূল্য দ্রব্যটি আনায় আটখানা এবং দুআনায় আঠারো খানা পাওয়া যায়। আর তা এখনই সংগ্রহ না করলে ঠকতে হবে।

দমদমায় নেমে দলটাকে একবার খুঁজল। গাড়ী থেকে নেমেই নতুন পাওয়া কাজের চিন্তা। দুশ্চিন্তা খানিকটা থাকলেও মেমাজটা খুশীতেই ভরে ছিল তার। সারাদিন লাইনে মোবাইল কোর্ট আর পুলিশের উপদ্রব। যে যার কাজে বেরিয়েছে সন্ধ্যায়। এখন আর দিনশেষের অবসর নয়—দিনশেষে লড়াই সুরু জীবনটাকে ধরে রাখবার জন্য। ওর ত এখন দিনান্তে দেড টাকার পাকাব্যবস্থা।

কানাইয়ের কোথাও যেতে ইচ্ছে হয না। একগ্লাস চা সুমুখে নিয়ে দুগালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। যে কেউ হোটেলে ঢোকে সে দিকে তাকায় আড়চোখে—দেখা নাই কারো। দেখা মিলবেও না। লাষ্ট ট্রেন পয্যন্ত আপ-ডাউন করছে—ভূমিকম্পের জলের মত একবার একূলে আর বার ওকূলে আছড়ে পড়ছে।

লজেন্সের বয়েমটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কানাই। ওরা কী তবে জানতে পেরেছে কানাইও সরলো? সেইজন্যই কী আসছে না এখানে। মনে মনে নিজেকে বড অপরাধী মনে হয় কানাইয়ের ওরা আর তাকে আগের মত আপন করে দেখবে কী? দেখাই হয়ত হবে না কারো সঙ্গে! আর সাতদিন অন্তর যদিও বা দেখা হয় ওরা কী আর তেমন মন খুলে মিশবে ওর সঙ্গে? ক্যানভাসারের জীবন খারাপ ছিল কিসে? উদায়াস্ত হাতুড়ী পেটা, বুড়ো শকুনটার খ্যাঁকানী ধোঁয়া কয়লা—এর চেয়ে অনেক ভাল। যতই হোক স্বাধীন!

রোজ ভোরের ট্রেণে যেতে হবে। যেতে হবে কাল থেকেই। ফিরতে পারবে কখন কে জানে। এক জায়গায় চুপচাপ বসে বসে কুড়ের মত ঠুকঠাক করা—তা হোক টাকা পেলে সব সইবে। বুকে পাথর চাপিয়ে আটপিঠে রোদেও পড়ে থাকতে রাজী।

পকেট থেকে পয়সা বার করে গোণে কানাই। এক টাকা সাড়ে ন আনা। একটা গাড়ীতে একটাকা সাড়ে ন আনা। এমন পাঁচখানা গাড়ী ধরতে পারলেই রোজগণ্ডা সই। অনেক দিন এমন বিক্রী হয় নি। হত প্রথম প্রথম। একবার শনিবার ছিল সেটা—উল্টাডাঙ্গা থেকে বেলঘোরের মধ্যে একটাকা ছ আনা বিক্রী হয়েছিল। পেঁচো বেচেছিল ন সিকে। ব্যবসার নিয়মই এই। লক্ষ্মিঠাকরুণ যেদিন যেভাবে তাকান।

কাল থেকে বাঁধাধরা পয়সা। যে পয়সা আসবে দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই। তাতে না আছে উল্লাস নেই কোন উত্তেজনা।

আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়—কানাই নড়েচড়ে বসে। যাওয়া-আসার পথে লজেন্স বিক্রী—যা দুপয়সা আসে। বিনা টিকিটে ট্রেনে যাতায়াত, লজন্সের বয়েম থাকলে টি. টি. ই-রা বলবে না কিছু। ওরা তবু লোক ভাল। কিন্তু ঐ শালার পুলিশ আর মোবাইলওয়ালা—হত পাকিস্তানের বাড়ী, মজা বুঝতে পারত ব্যাটারা! মানষে যে খেটে খাবে তাও হবার জো নেই ওদের জ্বালায়—শয়তানের মতই পেছনে লেগে আছে।

বিক্রী হোক না হোক যাওয়া-আসার পথে ট্রেনে কাজ করাই ঠিক করে কানাই। অভ্যাসটা থাকবে তাতে। কোন দিন বুড়োর মেজাজ কী হয় কে জানে—অত ভরষা না করাই ভাল। আজ ভাল—কাল হয়ত বলে বসবে চাইনা তোমাকে, তখন? তাছাড়া ঐ ত স্বাস্থ্য, যে কোন সময় টানটান হয়ে চোখ উল্টে মরে পড়ে থাকলেই বিচিত্তির! তখন ত আবার এসে এই লাইনেই নামতে হবে। মাথা পাগলা ঘাটের মড়া ও ফুটো নৌকোর

সামিল। তবে হয়ে গেল কাজটা—যে কদিন থাকে থাক—গেলে যাতে পথে বসতে না হয় সেটাও দেখতে হবে ত। সাড়ে চার আঙ্গুল কপালটা নেবে কে ?

শিয়ালদায় এসে গাড়ীটা দাঁড়াবার পরও কিছুক্ষণ বসে থাকে কানাই। যাত্রীরা নেমে যাক। কী হবে খামোকা গুতোগুতি করে! গাড়ী খালি হয়ে গেলে নামে সে। ঘড়িটার দিকে অভ্যাসমতই তাকায় একবার। সবে সাড়ে আট! এ ত সন্ধ্যে। ইচ্ছা করলে সে এখনই আট্টা চল্লিশের গাড়ীটা ধরে আগড়পাড়া থেকে অনায়াসে কাজ করে ফিরতে পারে। ভাল লাগে না আজ আর। মাকে সুখবরটা দিয়ে আজ একবার বাইরে বেরুবে। সন্ধ্যার কলকাতা—অনেকদিন দেখেনি সে। কতদিন দেখবে ভেবেছে একদিনও দেখে নি। এখনো চিড়িয়াখানাটা পর্য্যন্ত দেখা হয়নি তার। কতদিন চিড়িয়াখানার সুমুখ দিয়ে কাজের সন্ধানে গিয়েছে এসেছে একবার মনেও হয়নি ঢোকবার কথা। কৌতূহলী মনটা কী তার মরে গেল ?

সিটে ফিরে স্তম্ভিত হয় কানাই। বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। কী হল ? মা কাঁদছে বসে আর রমলা ওর বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দমকা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে দীনবন্ধুর মুখখানা নীল হয়ে উঠেছে।

কী হল মা? কানাই উদগ্রীব। উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায় জিজ্ঞাসা করে সে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সারদা। মুখটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলে। কানাই তাড়াতাড়ি হাতের বয়েমটা চালের বাক্সর ওপর নামিয়ে রেখে হেঁট হয়ে বাপের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ওর দিকে অপলকে চেয়ে থাকে দীনবন্ধু। ঠোঁঠের দুপ্রান্তের কম্পন দ্রুত হতেই চোখ বুজিয়ে নেয়। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে দু'রগ দিয়ে। তাড়াতাড়ি সেটুকু কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছে দেয় কানাই। পাশে বসে পড়ে। কথা সরে না মুখ দিয়ে।

কী করণীয় বুঝে পায় না। রমলার সঙ্গে সঙ্গে সেও দীনবন্ধুর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেই দেখে রমলা শুধুই হাত বুলুচ্ছিল না, তেল মালিশ করছিল। তেলে হাত পড়তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাতটা আপনা থেকেই সরিয়ে নেয়। বুকের মধ্যে গরম কড়ায় ঠাণ্ডা জল পড়ার মত বিশ্রী অনুভূতি হয়। ঝড়ের বেগে কতকগুলো সম্ভাবনার কথা মনে হয়। বাবারও কী পঞ্চাননের মত রক্ত উঠতে আরম্ভ হল না কী? ও রোগে ত মানুষ বাঁচে না—তবে কী হবে? কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না, পাছে আশংকাটা সত্য বলেই প্রতিপন্ন হয়। অথচ কী যে হয়েছে তা ঠিক করে না জানলে কর্তব্যও স্থির করা যাচ্ছে না।

রমলারই সাহায্য নেয় সে। কানাই ওর কাছেই চুপি চুপি ব্যাপারটা জানতে চায়। রমলার মুখে যা শুনল তাতে নিশ্চল পাষাণের মত বসে রইল কানাই। হাত থেমে গেল বাপের বুকে। শেষ পর্যন্ত এ-ও কপালে ছিল!

সারদা গুন গুন করে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল তা শুনে ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় এবং নিষ্ঠুর নিরূপায় আক্রোশে ফুলতে লাগল কানাই।

দীনবন্ধু নিত্যই বাইরে ঘোরে। ছোটখাটো মোট দু একটা প্রায়ই বাজার থেকে বহে আনে। বাইরের পুরাণো কুলিদের নজর এড়ায় না। দীনবন্ধুর এই অনধিকার অনুপ্রবেশের অপরাধ তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ভাগীদার বৃদ্ধি সকলের পেটেই হাত দেয়—একথা কানাইও জানে। ওরাও ত জোট বেঁধে কত সদ্য আসা ছোকরা ক্যানভাসারকে লাইনছাড়া করেছে। তা বলে এরকম নির্দয় প্রহার! অবশ্য প্রথম প্রথম দু একদিন ভয় দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা যে করে নি তা নয়। দীনবন্ধু নিরস্ত হতে পারে নি—নিরস্ত হতে পারে না। সে যে পয়সা জমাতে সুরু করেছে—জমি কিনবে!

খুন করে ফেলেছে প্রায়। ভাল করে কথাটা পর্যন্ত কইতে

পারছে না বুক পিঠের ব্যথায় যন্ত্রণায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সারদা। শৈশব অতিক্রম করে এমন কান্না বোধহয় কোনদিন কাঁদে নি সে। অথচ সে কান্না আর এ কান্নায় কত পার্থক্য!

কত আনন্দের দিন। নতুন কাজ পেয়েছে সে। এ কোন নতুন অমঙ্গলের সূচনা। ভয়ে হাত পা নিথর হয়ে থাকে কানাইয়ের। ক্ষোভে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। তারই অক্ষমতা এবং অযোগ্যতার জন্য দীনবন্ধুর আজ এই দশা। হয়ত তাকে লেখাপড়া শেখাবার প্রায়শ্চিত্তই ভোগ করছে! লেখাপড়া যাহোক কিছু শিখেছে সে অথচ সে-ই বোধহয় পরিচিত সমবয়সীদের মধ্যে সবার সেরা অকর্মা!

সারদা রাঁধে নি। ঝঞ্ঝাট ত বিকেলেই বেধেছে। মনোহরের মা এসে দেখে গেছে ওর বাবাকে। ওদের তেল ছিল না, মালিশ করবার জন্য খানিকটা সরষের তেল দিয়ে গেছে। আর কী করতে পারে? একবেলা সবাইকে ঘর থেকে রেঁধে এনে খাওয়ান—সে দিন কী আর আছে? দিন কখনও একভাবে যেতে পারে না, দিন যখন ফিরবে তখন এ সৌজন্য পড়শীদের শেখাতে হবে না কারো!

কানাই বাইরের দোকান থেকে কিছু মুড়ি আর দীনবন্ধুর জন্য একপোয়া গরম দুধ নিয়ে এল। মুড়ি খেয়ে আগেও কতদিন রাত কাটাতে হয়েছে। ও আর এমন শক্ত নয় উপোষের চেয়ে। তাছাড়া খিদেতেষ্টা কী আর আছে দেহে!

বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে দেখতে দেখতে যায়। দেখতে চায় সেই মানুষগুলোকে যারা দুর্বল পেয়ে দীনবন্ধুকে অমন করে মেরেছে। যেন তাদের গায়েই পরিচয় লেখা আছে! চিনে নিতে পারলে বোঝে একবার--লাইনে কী কোনদিন পাবে না। টুকরো টুকরো করে ফেলবে তখন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় যখন বোঝে যে লাইনে ওদের হয়ত কোনদিনই পাবে না আর ওদের গণ্ডীর মধ্যে ঠেঙ্গিয়ে যাওয়া, দল যত বড়ই হোক না কেন, সম্ভব নয়!

রমলা যখন বাঁ হাতে একটা কাঁচালঙ্কা আর কাগজে খানিকটা নুন নিয়ে শুকনো মুড়ি চিবুতে বসল কানাই সেখানে বসে থাকতে পারল না। রমলার মুড়ি চিবানোর প্রতিটি শব্দ ওর বুকটাকে ক্ষতবিক্ষত করে যেন। কালকেও ঐ রমলা ভাত পেতে একটু দেরী হলে কুরুক্ষেত্র বাধাত!

ওরও আজ বিকেলে নতুন জীবনে উত্তরণ ঘটেছে। বয়স বেড়েছে তার অভিজ্ঞতার!

কানাই চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষে পুলকার্টটার ওপর বসে একটা বিড়ি ধরায়।

বাদলী ভাতে ডাল ঢেলে মেখে দিয়ে তরকারী তুলে দিল পাতে। পর পর কয়েক গ্রাস মুখে তুলে সতীশ বলল, আমার কাছে এসেছে ওপর-চালাকী করতে! ওরে তোর মত কত ঘুঘুকে চরিয়ে চুল পাকালাম সে তালাস কর আগে, আসিস তারপর।

বিমর্ষ হাসিভরা ঘে না চোখ দুটো তুলে মেয়ের মুখে সমর্থন খুঁজে আবার খাওয়ায় মন দিল সতীশ। বাদলী নিরব। একটা কথাও বলল না সে। চোখ দুটো তার ছলছলে। স্নায়বিক শিথিলতায় সদা কম্পমান সতীশের দিকে তাকিয়ে সে চোখ দুটোয় জল ভরে আসে। রাগ হয় নিজের ওপর। নিজের বিধাতার ওপর। মেয়ে না হয়ে সে ত ছেলেও হতে পারত। তাতে কী ক্ষতি হত বিধাতার? এত বয়সে কত খাটতে পারে মানুষ? খাটনী আর খাটনী—আগুন আর লোহার সঙ্গে যুদ্ধ। তবু যদি পেটে ভালমন্দ একটু পড়ত কিছু। একরকম জোর করেই সতীশের জন্য দুবেলায় একপো দুধের বরাদ্দ করেছে সে; কিন্তু কী হয় তাতে! সারাজীবন খেটেছে দৈত্যের মত, খেয়েছে কী আর—আর জুটেছেই

বা কী। রক্তের যখন জোর ছিল তখন সহেছে এখন আর সইবে কত ?

ওকে রাখলেই পারতে, একা আর কদ্দিন খাটবে বাবা।

শ্-শালা! এক নজরে শালাকে চিনে নিইচি আমি। এ তোকে বলে রাখলাম বাদলী ও বংশীর দলেরই একজন। গরুচোর গরুচোর চাউনী—আবার বলে কৈবত্ত হেলো দাস! আমি ত তাহলে বাগের পো বামুন। নিজের রসিকতায় সরবে নিজেই হেসে ওঠে সতীশ।

কাজ করবে দোকানে—থাকবে বাইরে—বংশীর মত হলেই বা হয়েছে কী তাতে। খাটবে পয়সা নেবে, অত খাতির করবার দরকারই বা কী। তুমি যাই বল কেন তোমাকে আর অত খাটতে দোব না। খাটতে খাটতে অসুখে পড়—খুব হবে তাহলে।

সতীশের সব গুলিয়ে যায়। মেয়েটার যদি বিয়ের ব্যবস্থাটাও করে ফেলতে পারত ত নির্ভাবনায় যা খুশী তাই করা যেত। শরীরের কথা কে বলতে পারে আজ আছে কাল নেই। মেয়েটার যে দাঁড়াবার মত ঠাঁই দুনিয়ায় কোথাও নেই।

উঃ শালা আমার সব্বনাশ করে গেছে। এ্যাদ্দিনে তোর বিয়ের যা হয় এট্টা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারতাম বাদলী! তাহলে আর আমার ভাবনা ছিল কিসের—বগল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তা এই কপালে যা লিখিয়ে এসেছি তা খণ্ডায় কে।

নাও—বাজে কথা রেখে এখন খেয়ে নাও ত দেখি। আমায় বিদেয় কররার জন্যে যে তুমি আদাজল খেয়ে লেগেছ সে কী আর বুঝি না—আমায় তাড়ানো অত সোজা নয়! বিয়ে হলে কী হাত গজাবে আর দু'খানা? বিয়ে ত কত মেয়েরই হয় না—কুটাপ্পনের মেয়ে পারওয়াতী, রোজগার করছে খাচ্ছে, খারাপটা আছে কী? দরকার পড়ে আমিও কলে কাজ একটা জোগাড় করে নিতে পারব।

শিউরে ওঠে যেন সতীশ।' ভয় ভয় চোখে মেয়ের দিকে তাকায়। সব্বনাশীর মনে কী আছে কে জানে! ও কী জানে কলে

কাজ করতে যাবার অর্থ? কাজ এক কথায় পাবে বটে কিন্তু তার জন্য যে নজরানা দিতে হবে সেটার কথা কী ও জানে না?

অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে সতীশ। কণ্ঠরোধ হয়েছে যেন তার। এ সুযোগ হারায় না বাদলী।

লোকটাকে আমি কাল থেকে কাজে আসতে বলে দিইছি কিন্তু। ঐ দেড়টাকা রোজ—বংশীকে যা দেওয়া হত।

অনেকক্ষণের আটকে থাকা নিশ্বাসটা ফেলে সতীশ। বাদলী যখন ব্যবস্থা করে ফেলেছে তার ওপব কোন কথা যে চলবে না এটাই তার বিশ্বাস। তবু বংশীব কথাটাও ত ভোলা যায় না। তাকেও ত বাড়ীর ছেলের মত আদর যত্নেই রেখেছিল—সে এমন সর্বনাশ করে গেল কেন? বিশ্বাসের মূলে কোথায় যেন একটা মস্তবড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তারপর থেকে, কাউকেই যে চেষ্টা করেও আর বিশ্বাস করা যায় না। সেই যে গেল আর ত ফিরল না বংশী। আর এমন কাজ করে গেল—পেরমাই কমিয়ে দিয়ে গেছে শয়তানের বাচ্চা! বুকের রক্ত জল করা পয়সা—একটা একটা করে জমানো পয়সা, একটার পর একটা দিন পরমায়ু থেকে খসেছে যার প্রতিটি আধলা সঞ্চয় করতে, তাই নিয়ে ভাগল সে! রোগ হলে এক ফোঁটা ওষুধ খায়নি সতীশ, পরনের কাপড়ে গেরোর পর গেরো দিয়ে ছেঁড়া ঢেকেছে আর সেই পয়সা নিয়ে পালা'ল! এ্যাদ্দিনে হয়ত মেয়েটার যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত টাকাগুলো থাকলে। এককোঁচড় টাকা!

বংশীও গেছে—তারপর আর কারিগর রাখবার কথা শুনতে পর্যন্ত পারে না সতীশ। মেয়েটার জন্যে একটা নাকছাবি গড়িয়েছিল বাইশ টাকা খরচ করে—হালকা নীল পাথরের—সেটা পর্যন্ত রেখে যায়নি হারামীর বাচ্চা!

ও চলে যাবার পরও কতদিন ভেবেছে আবার হয়ত ফিরে আসবে সে—আর সে যদি ফেরে টাকাগুলোও ফিরবে বলেই মনে

হয়েছে। কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি বংশী তার সর্বস্ব চুরি করেছে—লাভ হয়নি তাতে কিছু। ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠেছে ক্রমশঃ—নিজের কাছে লজ্জায় নিজের মাথা হেঁট হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। সে মাথা আর এ-জীবনে বোধ হয় উঁচু করতে পারবে না সতীশ। মানুষকে বিশ্বাস করবার মনটা মরে গেছে—এ বয়সে আর তাকে বাঁচিয়ে তোলবার সময় পাওয়া সম্ভব নয়! এ বয়সে যা যায় তা আর ফেরে না।

কানাইকে রাখতে মন সায় দেয় না। তবু মেনে নিতে হয়—বাদলা যখন কথা দিয়েই দিয়েছে, তা আর ফেরান যায় কী করে! কাটা খাসা কী আর বাঁচান যায়! তাছাড়া মেয়ের দিকটাও দেখ্‌তে হবে ত। যা অভিমানী, মরে গেলেও মায়ের মতই মুখে বলবে না কিচ্ছুটি—কিন্তু মনে মনে ঠিক ভাববে যে সতীশ তার একটা কথাও রাখে না—জন মানদারএর কাছে পর্যন্ত মাথা হেঁট করায় তার। ও ত আর বুঝবে না কতদিকে চোখ রেখে সতীশের চলতে হয়। এত সতর্ক থেকেও বংশীটা কী সর্বনাশই করে গেল। বংশীকে সে নিজে রেখেছিল। শুধু কী তাই যেদিন চুরি করে ভাগল তার আগের দিন পর্যন্ত সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে তার পেটে কী আছে! জানলে কী আর এ-সর্বনাশ হয়! যার বিয়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছে তাকে বলেনি কিন্তু বংশীকে ঠিক বলে ফেলেছিল সতীশ। অবশ্য সে ব্যাটাও এমন ধড়িবাজ পেটের খবর ঠিক টেনে বের করেছিল ওর কাছ থেকে।

কানাইকে কাজে লাগিয়েছে বাদলা—ভালই হল একদিক থেকে। ল্যাম্পো তৈরীর কাজটা বংশী চলে যাবার পর থেকে বন্ধ। দুটো পয়সা ছিল কাজটাতে। এটাকে যদি গড়িয়ে পিটিয়ে নেওয়া যায় তবে কাজের লায়েক হবে বলেই মনে হয়। বন্ধ কাজটা আবার চালু করা যায়। মাথায় আরো একটা মতলব অনেক দিন থেকে ঘুরছে। কিন্তু পুঁজি যদি ল্যাম্পের কাজটা থেকে জুগিয়ে

নেওয়া যায় তবে পেতলের কব্জার কাজটা ধরবে। জন দুই তিন কারিগর রেখে কাজটা ঠিকমত চালু করতে পারলে দিনান্তে কেনোঝেলেও খরচ খরচা বাদে কোন না পাঁচ সাতটা টাকা তবিলে উঠবে। বাদলীর বিয়ে দিতে কটা দিন লাগবে তাহলে? উঠতি বয়েসে শিখেছিল কাজটা—হাতের কাজ দুদিনে ফের রপ্ত হয়ে যাবে। অবিশ্যি অনেকদিন হয়ে গেল শিখেছিল, গ্রাম থেকে যেবার নির্মলাকে পাকাপাকি নিয়ে এসে শহরে বাস করতে সুরু করেছিল সেবার। কতদিন হয়ে গেল তবু যেন মনে হয় সেদিনের কথা! সে উৎসাহের গন্ধটুকুও অবশিষ্ট নেই আজ আর। সেদিনকার জীবন সংগ্রামে ছিল যৌবনের ঔদ্ধত্য আর আজ শুধুই বার্ধক্যের আবিলতা, শংকা।

দ্যাখ বাদলী, ও কাজ করবে দোকানে—থাকবেও এই দোকানে। বাসার দোর আর এ ব্যাটাকে চেনাচ্ছি নি। বাইরে বাজারের পয়সা দিয়ে আসবি, বাজার করে এনে দোকানে রাখবে, নিয়ে আসবি। একরত্তি ভালমানষি নয় আর! আদর দিয়ে দিয়ে বংশীকে স্বগ্‌গে তুলিছিলি তুই-ই—আঁস্তাকুড়ের কুকুরকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দিলে কী হয় দেখে শিখলি ত এবার। সব সময় মনে মনে জপ করবি—তুই মনিব আর সে ব্যাটা চাকর—ব্যস! নড়তে চড়তে হুকুমের ওপর রাখতে হবে—না পারলে সাফ জবাব, ভাগো! আভি নিকালো! ভাত ছড়ালে শহরের সব কাকগুলোকে বাড়ীর উঠোনে এনে জড়ো করা যায়। দ্যাখ না আমি কি করি। কাজের কথা ছাড়া একটা কথাও যদি বলি তার সঙ্গে তবে আমি সতীশ বাগই নই। তামাক সাজ হাতুড়ী মার। কয়লা দে। জল আন। ব্যস্—ওচাড়া রামগঙ্গা কিচ্ছু না। ব্যাটাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বললেই মাথায় চড়ে বসবে। সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে যেন আজ উকো কাল পঞ্চু পরশু ছেনী না হাতায়। এ না হলে আবার ঠিক কপাল চাপড়াতে হবে কোন দিন।

বেশ তা হবেখন—এখন দুধভাত কটা খেয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড় ত, রাত অনেক হল।

দুধের বাটিতে গরম ভাত ভিজানই ছিল। ভাল করে মেখে দেয় বাদলী। বাটিতে চুমুক দেয় সতীশ। বাদলী তামাক সাজতে চলে যায়। পাশেই ঘটিতে আঁচাবার জল রেখে গেছে। সতীশ উঠানে নেমে আঁচায়। দুধটা কেমন যেন পানসে লাগল আজ। ব্যাটা বংকা ঘোষ মিউনিসিপ্যালিটির খাড়াগরুর বাঁটের দুধের মাত্রা গাঁজার ঝোঁকে বাড়িয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

হুঁকোর মাথায় গনগনে আগুন শুদ্ধ কলকেটা চাপিয়ে ওর হাতে দিল বাদলী। বলল, তামাক খেয়ে নাও ততক্ষণে। খেয়ে উঠেই মালিশ করে দোব—আবার যেন ঘুমিয়ে পড় না।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই তামাক টানে সতীশ। কাশে পাশেই ছাইয়ের সরা, গয়ার ফেলে তাতে।

বাদলী এসে বুকে পিঠে তেল মালিশ করে দেয়। হাতপা টেপে যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ। বারণ করলেও শোনে না। সতীশও ওর বারণ শোনে না। যতক্ষণ দেহ চলে খাটে। হাত যখন আর তুলতে পারে না তখন থামে। তার একটু আগে নয়। আজ গতর বইছে। জুটছে দুবেলা দুমুঠো। কাল যদি চোখ বুজোয় কী গতি হবে মেয়েটার। বছর নয় ত জল—দেখতে দেখতে বয়েসও কম হল না বাদলীর—সে দিনের খুকী আজ ভাদ্দরের ভরা নদীর মত থমথমে ভরা জোয়ানী—সাধ আহ্লাদের বয়েস এখন, এখন যদি বিয়ে দেওয়া না হয় তবে পরে দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান। আবার যা তা একটা ধরে দেওয়া সেত কসাইএর কাজ, বাপের নয় বিয়ে যদি না হয় তা-ও ভাল তবু যাতা একটা ধরে দিতে পারবে না সতীশ। পাত্তরের আবার অভাব কোথায়—অভাব টাকার। লোকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা নেয় সতীশ টাকা দেবে, তবে কেন সেরা পাত্র সে পাবে না?

কী সর্বনাশটাই করে গেছে বংশী!

নড়তে চড়তে সতীশ অভিসম্পাত দেয় বংশীকে। হাতের তামাক পোড়ে টানতে ভুলে যায়। একদলা সর্দি এসে গলাটা চেপে ধরে যেন। কাশতে কাশতে হাঁফ ধরে যায়, মুখ ভর্তি গয়ার সরায় ফেলে দিয়ে মুখটা মুছে নেয় বালিশের ওয়াড়ে।

কানাই সকালে পান্তা খেয়ে আসে আবার খায় রাতে ফিরে। সারাদিন কাজ। কাজের চেয়ে বেশী কাজ-শেখবার কাজ। কাজ তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। সতীশ ওকে সাদামাটা কাজ দেয় প্রথম—হাত চালু হোক আগে। ছোটখাট বঁটি, খুন্তী, রুটি সেঁকবার চিমটে হাতা।

সূক্ষ্ম কাজ নিজেই করে। তেমন কাজ কোথায় এখন। একে চোখ গেছে তার ওপর কলে তৈরী জিনিষ বাজার ছেয়ে ফেলেছে। কত কম দাম তার! লোকে কেন আসবে টাটার কোদাল ফেলে ওর কাছে দুগুণ দামে কিনতে? এককালে চাষের সরঞ্জাম তৈরীতে কলবাজারে সতীশের জুড়ি ছিল না—এখন সে সব স্বপ্ন বলে বোধ হয়, মনে হয় আরেক জন্মের কথা। আশপাশের চাষীরা কলবাজারে আনাজপাতি নিয়ে আসত পায়না দিত কাস্তে, বিচুলি কুচোবার কাস্তে বঁটির। একচেটে কাজ ছিল সতীশের। যেমন পুঁড়ি তেমনি পান। যে সে কথা নয় কাস্তের পান দেওয়া। দেখতে হত না, এক পুঁড়িতে তিনটি বছর চলে যেত হেসে খেলে। চোখের সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে পড়েছে ইতিহাস, আজকের উপমা!

দা হেসো এখনো আসে, করেও। কাজ আর তেমনটি হয় না। খদ্দেররাও খুঁত খুঁত করে। নেহাৎ সাবেক খদ্দের তা-ই আসে। তাদের অভ্যাস টেনে আনে। সতীশ বলেই দেয় কাজ আর তেমনটি

হবে না। তারাও জানে। সেদিনের মত যখন দুনিয়ায় কিছুই রইল না তখন আর এটুকু নিয়ে আফশোষ করে লাভ কী! তারা আসে। কাজকে উপলক্ষ্য করে এসে দুটো সুখদুঃখের কথা বলে মনটা হাল্কা করতে পারাটাই বাড়তি লাভ। অন্য জায়গায় ত আর সেটি হবে না। সবাই কী সব কথা বোঝে।

কত পুরাণ লোক, কত লোকের সংসারের কত খবরই জানে সতীশ। যেন তাদের সংসারেরই একজন। কাজের ফাঁকে বসে বসে তামাক টানতে টানতে পুরাণ দিনের সুখের কথা হয়। বর্তমানের অচিন্ত্যপূর্ব সমস্যাবলীর পর্যালোচনা হয়। যে দিন গেছে তা আর ফিরবে না। তবু সেদিনের সাক্ষ্যি কোন একজনের সঙ্গে বসে সে সব দিনের কথা বলায়ও যে কত আনন্দ কত তৃপ্তি—কিছুটা স্বাদ তবু পাওয়া যায়। রোগগ্রস্ত শিশু যেমন মুখরোচক খাদ্যের কথা বলে বা শুনে খেতে না পাওয়ার অভাবটা পুরিয়ে নেয়।

হারান দিন। আশা আনন্দে উচ্ছল উজ্জ্বল দিন। জীবনে ছিল প্রাচুর্য, গতি। যৌবনের সম্পদ। বার্দ্ধক্যে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধুপ জ্বলে জ্বলে সব গন্ধটুকু বাতাসে দিয়েছে ছড়িয়ে। পড়ে রয়েছে গন্ধহীন বিবর্ণ ছাই। নৈরাশ্য দুঃখ আর আশাভঙ্গ মানুষগুলোকে যেন পাথর করে দিয়ে গেছে। রাজপথের পাশে তারা শুধু আকাশে মাথা তুলে সেদিনের গন্ধ নেবার জন্য প্রাচীন বিটপীর মতই খাড়া হয়ে রয়েছে। তবু এখনো মাঝে মাঝে সেই প্রাচীন শুষ্কপ্রায় মহীরূহে যখন হঠাৎ কিশলয় দেখা দেয় তখনই মনে পড়ে পুরানো দিনের বসন্তের কথা। মুখর হয়ে ওঠে মানুষগুলো। সেদিন যে ঝড়ঝঞ্ঝা তাদের মথিত করতে চেয়েছে সেগুলোকেও বেমালুম চেপে যায়—ইচ্ছা করেই ভুলে থাকে। যে পথকে ডিঙ্গিয়ে এসেছে তাকে গুরুত্ব দিলে বিজিতকেই নিজের চেয়ে বড় করা হয় বলে সফলতাটুকুকেই ওরা বড় করে দেখায়।

ওদের কথা শোনে কানাই। বেশ লাগে শুনতে। স্বপ্নে ঘেরা

যেন দিনগুলো! হয়ত হাপর টানতে টানতে সমর্থনসূচক কোন মন্তব্যও কখনো করে বসে। বৃদ্ধরা কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। ও ধরতে গেলে কালকের ছেলে, কতটুকু জানে আর দেখেছেই বা কতটুকু।

কোন ফাঁকে হয়ত বাদলী এসে দাঁড়ায়।

বাজারে যেতে হবে বেলা হয়ে গেল যে। তোমার তামাকও ত আনতে হবে বাবা। চোখদুটো কানাইএর উপর দিয়ে ঘুরেও যায় একবার।

হ্যাঁ, তামাক নেই ত! তামাকের মালাটা দেখে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে সতীশ, মাছটা একটু ভাল দেখে আনবে।

চোখদুটো কয়লা চাপা আঁচের মধ্যে কী যেন খোঁজে। বাঁ হাঁটুর নীচে পাশ বালিশের মত বাঁশের চোঙটা জুৎ করে টেনে নেয়।

কালকের মাছ কী খারাপ ছিল? কানাই বাদলীকেই প্রশ্ন করে। তাকায় ওর দিকে। তাকাবার জন্য উপলক্ষ্য চাই এবং প্রশ্নটাও সেজন্যই আপনা থেকে এসে যায় মুখে।

খারাপ নয়, তবে ''কা ইলিশ কাটা—ইলিশটা বাবার পেটে সহ্য হয় না তেমন। চারা পোনা পেলে ভাল না পেলে ট্যাংরা পারশে যা হয়। উত্তর দিল বাদলী। সতীশ আরম্ভ করলে বকবক করে এখনই হাজার গণ্ডা কথা বলে যাবে। এক চিলতে মাজা হাসিও কথার সঙ্গে ঠোঁঠে লেগে থাকে ওর।

হাপরের আঁচ থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় কানাই। বাইরে চনচনে রোদ। রাস্তার পীচ গলতে সুরু করেছে। আবর্জনার স্তূপ থেকে শুঁটকো দুর্গন্ধ উঠছে। বেরুবার উপায় নেই—একটু রোদ না পড়লে এত পথ যাওয়া কষ্টকর—বসে থাকে চন্দনপুরের ওসমান। একগোছা কাঁচাপাকা দাড়ীর মধ্যে অনেকগুলো বছরের ঐতিহাসিক নিদর্শন চাপা পড়ে আছে। ব্যথিত চোখে

বাদলীর দিকে তাকাতে বাদলী ভিতরে চলে গিছল। একান্ত পরিচিত দৃষ্টি। বাপের আমলের যে সব বুড়ো কৃষক এসে তামাক টানে, কোন এক স্বপ্ন যুগের গল্প করে তাদের চোখের ও দৃষ্টি দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে! একই রকম ব্যথাকরুণ মূক দৃষ্টি। নিরূপায় ব্যথা। ঘরের মেয়ের বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাবার পরও আইবুড়ো থাকার সশংক বেদনা। কতদিন সতীশের চোখেও ঐ বিমর্ষম্লান গোধূলি আলো দেখে উচ্ছল আনন্দে মুখর হয়ে উঠতে হয়েছে।

দু এক জায়গায় বিয়ের কথা হয়েছিল তার। কে জানে কেন সুরুর পর আর বেশীদূর তা এগোয় নি! সতীশও ও সম্পর্কে আর কিছু উচ্চবাচ্য করে নি।

বিয়ের কথা বাদলীও ভাবে। না ভেবে উপায় নেই। যৌবনের চিহ্নগুলো দেহে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে যে কথা ভাবত সেকথাই সরবে নিজের কাছে জাহির করে। দেহের প্রয়োজন আর মনের প্রয়োজন যৌবনতেজে একাকার হয়ে যাবার পর থেকে আর লজ্জা করে না। বিশেষ পুরুষটির বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গন, পেশল বক্ষের নিবিড় আসঙ্গ, সবলপুষ্ঠ ওষ্ঠের নিষ্ঠুর নিপীড়নের স্বপ্ন মনকে বুঁদ করে রাখে, দেহের কানায় কানায় সে তরঙ্গের আঘাত হিল্লোলিত শিহরণ ছড়িয়ে দেয়।

এক এক সময় বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে।

দুপুরে বস্তীর অধিবাসীরা খেতে আসে। হৈ চৈ হট্টগোল। বাচ্চাগুলো এদিক ওদিক থেকে ঠিক এসে জুটে কান্না জুড়ে দেয় নয়ত মাকে বিরক্ত করে। পুরুষের পুরুষ কণ্ঠে মিষ্টি কথা বলবার প্রয়াস; সব মিলিয়ে বস্তী গমগমে। কলতলার জল নিয়ে একচোট কুরুক্ষেত্র এ সময়ে অনিবার্য! দুচারটে কিল চড়ের শব্দও পাওয়া যায়! ভরদুপুরে একপেট তাড়ি গিলে এসে বৌ ঠেঙাচ্ছে কেউ হয়ত!

ভেঁপু বাজতে না বাজতে সব ঠাণ্ডা। আশ্বিনের মেঘের মত

নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে সবাই। পড়ো গাঁয়ের স্তব্ধতা ফিরে আসে বস্তীতে। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত বেওয়ারিশ কুকুরের মত কোথায় কোথায় ছিটকে পড়ে কেবল তারাই জানে। রাস্তায় গিয়ে নর্দ্দমার ময়লা ঘাঁটে, পথের ধূলো পাথর জড় করে মা যে কারখানায় কাজ করে সেটাই তৈরী করার কাজে ব্যস্ত থাকে, নয়ত আকাশে পাথর ছোঁড়ে। পাথর যে কোথায় গিয়ে পড়বে তা জানবার দরকার নেই ওদের। মাঝে মাঝে একঝাঁক পাথর উড়িয়ে দিয়ে নিজেরাও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাদলীর ঘরের চালায় এসেও পড়ে এক আধটা। সতীশের কানে সে শব্দ গেলে আর নিস্তার নেই। তুনিয়ার সকল শিশুর গুষ্টি শুদ্ধকে খিস্তিতে স্নান করিয়ে ছাড়ে। কেমন যেন মায়া লাগে বাদলীর। রাগ হয় বাচ্চাদের মায়েদের উপর। মনে মনে তাদের গালাগাল সে-ও বড় কম দেয় না। মানুষ করতে না পারিস ত বিয়োস কেন মাগীরা—পথে ছেড়ে দেবার জন্যে! কতলোকে একটা ছেলের জন্যে হাজার দেবতার চুলে ঢিল বাঁধছে আর তোরা—? অমন বিয়োন ত শ্যাল কুকুরেও বিয়োয়!

মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে পাশের ঘরের ভাড়াটের বৌটাকে বলেও। মুখে একরাশ কালো হাসি ছড়িয়ে পড়ে তেলেংগী মেয়েটার। বলে যে, ছেলে প্রসব করব, গতরে খেটে তাকে খাওয়াব যতদিন না খাটনীর লায়েক হয় ততদিন। ভাল হল কী মন্দ হল তাও দেখব? কেন, মা হয়ে কী এমনই অপরাধ করে ফেলেছি? ছেলে কী রোজগার করে আমার বুড়ো বয়সে খাওয়াবে? চোর হোক রাণ্ডিখোর হোক আমার বয়ে গেল। চুরি লুচ্চামী তো আর আমার ঘরে করবে না—যাদের ঘরে করবে এইবেলা তারাই একটু ওর দিকে নজর দিক না। তুই-ই করনা বাদলী—তোর পক্ষে কাজটা এমন শক্তও নয়। কারখানার সায়েব সর্দারদের মন জুগিয়ে রুজির জোগাড় ত করতে হয় না তোর, ঘরে মরদও নেই যে তার হামলা সইতে হচ্ছে।

আরো অনেক কথা বলে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী, বুঝতে অসুবিধা নেই। ভাষার দুর্বলতাটুকু অনুভূতি দিয়ে পূর্ণ করে দেয়। হালকা করে বললেও কথাগুলো নাড়া দিয়ে যায় বাদলীর মনে। থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে সব স্নায়ুগুলো। বুকের কাছে নিবিড় করে পেতে ইচ্ছা হয় নরম দেহ হৃষ্টপুষ্ট ছোট্ট একটা শিশুকে। দিন দুপুরে ঘরে শুয়ে কতদিন এই অনাগত বৈদেহী শিশুকে আপন বক্ষের উষ্ণতার মাঝখানে চেপে ধরেছে। কুমারী স্তনের প্রতিটি স্নায়ু শিরা উপ-শিরা প্রতিটি কোষ জেগে উঠে সেই অনাগতের দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়েছে। অবসাদের চাপে শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের গুমরানী কান্না চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়তে গিয়েও বেরুতে পারেনি। চোখের কোণে বাষ্পটুকু গাঢ় হয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে মিশে গিয়েছে পৃথিবীর উত্তাপে।

নির্জন শয্যায় চেয়েছে একজন শক্ত সমর্থ পুরুষকে, যার মনে কেবল ওরই স্বপ্ন, ওরই ছবি। কৈশোরে যে পুরুষের মনকে ছুঁতে চেয়েছে আজ সেই পুরুষের দেহটাকেই আগে চায়। যে পুরুষকে বাদলী দেখেনি কোনদিন অথচ মনের নিভৃতে যার নিত্য আনাগোনা।

আঁচ ধরিয়ে স্নান সেরে আসবার সময় চালটা ধুয়ে আনে একেবারে। ভিজে কাপড়েই মাজা বাসনগুলো উপুড় করে রাখতে রাখতে গুণ গুণ করে গান গায়। চলতি কোন ভাষা নেই সে গানে, সংগীত শাস্ত্রের কোন নির্দেশই মেনে চলে না তার সুর। মনের গভীর থেকে জেগে ওঠে। স্বয়ম্ভূ। কেবল নিজেকে শোনাবার জন্যই এ গানের সৃষ্টি। এ গানের উৎপত্তি স্বত্বার অস্তিত্বের অবিসম্বাদিত স্বীকৃতিকে রূপায়িত করার জন্য। অর্থহীন ভাষা—ভাবের ঐশ্বর্যে টইটুম্বুর।

চায়ের জল নামিয়ে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে ছোট্ট আরশিটার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। একরাশ ভিজে কালোচুল পিঠ অন্ধকার করে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'একফোঁটা জলের চিকিমিকি। সযত্নে মোটা চিরুণীটা সেই চুলের রাশির মধ্য দিয়ে টেনে নেয় বাদলী। মুখটা আরেকবার ভিজে গামছা দিয়ে মুছে নেয়। রঙিন কৌটা খুলে একটা কাঁচপোকার টিপ ধুনোর আঠা দিয়ে পরে নেয়। মোটা ভ্রূ-দ্বয়ের মাঝখানে পড়ে টিপটা হেসে ওঠে যেন— বাদলী নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সৌন্দর্য দেখে। শেষবারের মত ভিজে গামছাটা আলতোভাবে মুখের উপর বুলিয়ে নেয়। আরশীটা ওকে টেনে ধরে রাখে যেন—সরতে পরে না। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে একেক সময় এত ভাল লাগে! হঠাৎ একেক দিন নিজেকে বড় সুন্দর মনে হয়। আপন রূপগহনে ডুব দিয়ে মনের কামনা রূপায়িত হয়েছে কল্পনা করতেও ভাল লাগে। চেয়ে চেয়ে আশা মেটে না, মনে হয় বিশ্বের সৌন্দয বুঝি চিরচেনা মুখের ফাঁদে আটকা পড়েছে, বিশ্বের যত আলোকচ্ছটা বুঝি সেখানেই কেন্দ্রীভূত।

বাজার রইল।

অপ্রস্তুত বাদলী পিছন ফিরে দেখে কানাই তখনও বাজারের থলি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই মাথা হেঁট হয়ে যায় কানাইয়ের। মৃদুহেসে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার ভান করে আরশীর সুমুখ থেকে এসে হাত বাড়িয়ে থলিটা নেয়। দুহাতে হাতল দুটো ধরে ভিতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তেঁতুল এনেছেন?

হাঁ।

কানাই পিছন ফেরে। কাজ ত তার মিটে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থই হয় না। আবার পা-ও চলতে চায় না। কিসের দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে টেনে ধরে রাখে যেন। ছি ছি কী ভাবল বাদলী—লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়

কানাইএর। আবার মনে হয়, বাজারের থলিটা চুপি চুপি নামিয়ে রেখে চলে এলে বেশ হত।

তবুও পুলকিত হয় কানাই! এক নতুন মানুষ এবং নতুন বিশ্ব যেন সে তার নিজের অজ্ঞাতসারেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। এ বাদলীকে সে আর আগে কোনদিন দেখেনি। বাজারের হিসাব-নিকাশ, দোকানের লাভ-লোকসানের খতিয়ান, ঘরকন্না, বুড়ো বাপের খবরদারী করে যে বাদলী তাকে দেখলে একবারও মনে হয় না যে এক সুকুমারী যুবতী তার তনুমনের সমস্ত উপচার উপুড় করে আত্মসমাহিত হয় আনমনা হয়ে পড়ে ভুলে যায় পৃথিবীর কথা, সংসার অসার হয়ে যায় নিজেকে বাদ দিলে—ভাবে কেবল নিজের কথাই—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, গল্প করে আপন দেহের প্রতিচ্ছবির সাথে।

কানাই এর মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল ফোঁড় তুলে বসে আছে সে। বাদলীর বয়সের কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সে যেন বাদলীর অনেকখানিকেই অস্বীকার করে বসে ছিল বাদলীকে নূতনরূপে দেখল নিজের চোখের আলোয়—এ বাদলীকে ইতিপূর্বে দেখে নি।

কই চলে যাচ্ছেন কেন? বাদলীব মুখময় লজ্জার রক্তিমাভা স্নিগ্ধ হাসির জ্যোৎস্না দীপ্তিতে সুস্মিত।

চা হয়ে গেছে, খেয়ে যান একেবারে। পা-টা ধুয়ে নিন—জল আছে বালতীতে। বাদলী গিয়ে চা ছাঁকতে বসে। বলে, মগটা ওরই মধ্যে আছে।

হাত মুখ ধুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে কাপড়ের খুঁটে মুখ মোছে আর ভাবে কানাই। ভাবে একী রূপ আজ দেখল সে। সদ্যস্নাতা প্রসাধনরতা কন্যকার দেহের সীমারেখার প্রতিটি ভাঙ্গনের গভীরে তার বিলুপ্তি ঘটেছিল, তলিয়ে গিয়েছিল বচনাতীত অভীপ্সায়। মনের প্রচণ্ড আলোড়ন তাকে বাধ্য করেছে বাদলীর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকতে। ফিরে যাবার কথা মনে হতেই অসহায় বোধ হয়েছে নিজেকে—শেষ অবলম্বনের মতই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

কথা বলে।

বা রে—বেশ লোক ত! উঠে বসতে পারেন নি। ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে। পিঁড়িটা এগিয়ে দেয় বাদলী। ওর চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, কাল একটা জিনিষ রেঁধেছিলাম—খাবেন? অবিশ্যি ভাল লাগবে না হয়ত।

কানাই কিছু বলে না চুপ করে বসে থাকে। বাদলী কুলুঙ্গী থেকে মাঝারী একটা বাটি পেড়ে এনে ওর সুমুখে রেখে বলল, বড কাঁটালের এক পুরোণো খদ্দের চারটি কামিনীসরু চাল দিছল, বাবা পায়েস ভালবাসেন একটু পায়েস করেছিলাম। বাবা বলল আপনার জন্যে রেখে দিতে—

কানাই এর জন্য একবাটি আগেই তুলে রেখেছিল বাদলী। সতীশ খেতে বসলে জিগ্যেস করেছিল, তোমার নিতাই এর জন্যে খানিকটা রেখে দোব বাবা?

তা দে না। চমৎকার হয়েছে রে বাদলী। তেমন আগের মত দিন যদি থাকত ত সব টুকুই এক চুমুকে সাবাড করে দিতাম দেখতিস। খাওয়া ফুরোবার দিন এসে গেছে এখন খাওয়া কমতেই থাকল। আর যে কটা দিন বাঁচি দুর্ভাবনা আর বদহজম—এছাড়া সব চুকিয়ে ফেলেছি!

আফশোষে দীর্ঘশ্বাস পড়ে সতীশের। কোন আশাই জীবনে সফল হয় নি। সার্থক হয় নি ন্যূনতম কামনাও। বাদলী কথা বলে নি। চুপ করে বসে বসে পরম ধৈর্যে বাবার কথা শুনছিল। বুক তার টনটন করে বেদনায়। এই বয়সে কত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন মানুষের অথচ সে কী করতে পারছে। দেহমনের স্বাচ্ছন্দ্য সতীশ পেতে পারত সে যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত। ওর খাটনীর বোঝা বাদলা যদি নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পারত তা হলে বার্দ্ধক্যের দিনগুলো স্বস্তিময় অবসরে ভরিয়ে তুলতে পারত সতীশ। সম্ভব হত ক্ষীয়মান আয়ুর অশ্ববল্গা আকর্ষণ করা। আরো কিছুদিন বেশী বাঁচত সতীশ। বাদলীর চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

নিরুপায় সে—হাত পা তার বাঁধা। প্রকৃতি করেছে মেয়ে আর পিতৃ-সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার করেছে বন্দিনী। বহু ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন জাতির সমাহার শিল্পাঞ্চলের সমাজ চলে তার আপন খুশীমত। বাহিরের কোন নির্দেশ বা বিধান কেউ মানে না, মানবার প্রয়োজনও হয় না। চির অগ্রসরমান, প্রত্যক্ষ জীবনানুগ মস্তিষ্কের সাথে সাথে দেহ মনও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে, এগুচ্ছে যান্ত্রিক নিয়মে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এখানে মনুষ্যত্বের তার বেশী আর কিছু যদি প্রত্যাশা করা যায় হতাশ হতে হবে। এবং সেই মনুষ্যত্বই হাতে মশাল জ্বালিয়ে অন্ধ গলির প্রতিটি ছিদ্রে খুঁজে দেখছে যদি এই মাতাল যান্ত্রিকতার হাত থেকে কোন রকমে বেরিয়ে পড়া যায় দুনিয়ার আলো বাতাসে, গিয়ে যদি মুক্ত প্রান্তরে শুয়ে বুক ভরে নেওয়া যায় মুক্ত বাতাসে।

সতীশ বাদলী কেউই যেন এ সমাজের কেউ নয়। পরগাছা। প্রাণরস নিংড়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন যোগ নেই। কোন দূর পল্লীর আমজাম কাঁঠালের ছায়ায় ওদের নীড়—নীড় ওদের মননের পথচলার ধারে কোন ছায়াকুঞ্জে। সোনাচন্দনপুরের নৃসিংহদাস বা বড় কাঁঠালের আবুল সেখের সঙ্গেই ওদের সামাজিক লেনদেন। আযৌবন কলবাজারে কাটিয়ে দিয়েও সতীশ কলবাজারেরই একজন হতে পারল না। জীবনভোর সে করে চলেছে মৃতের দেহে প্রেত সঞ্চার করে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ ভয়াবহ এবং আত্মঘাতী প্রচেষ্টা।

যান্ত্রিক যুগের শিল্পশহরে বসে সে স্বপ্ন দেখে প্রায় অর্ধশতাব্দীর আগের কোন এক গ্রামের জীবনের। যে জীবনের স্বাদগন্ধ সে গ্রামেও আজ আর অবশিষ্ট নেই একটুও। দিনের পর দিন কেটে মাসগুলো বছর শেষে আবার ঘুরে এসেছে এমন করে কতদিন কেটেছে সতীশই তা আজ আর ঠিক করে বলতে বলতে পারবে না তবু সতীশের মনের পটে আঁকা ছবি বিবর্ণ হয় নি বরং তা আরও ভাস্বর হয়ে উঠেছে তিলতিল করে কল্পনার জ্যোতিকণার সমাহারে।

মাঝে মাঝে মনটা ছুটে যায় সেই ফেলে আসা গ্রামে, যেখানকার পাঠ চুকিয়ে যৌবনের প্রথম দখিনা তাকে শহরের জনারণ্যে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল। যে জীবনে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না কোন নতুন ঢেউযের মাতন যার জন্য যৌবন থাকে উন্মুখ হয়ে। সে জীবন চালিত হত বৃদ্ধের নির্দেশে—প্রয়োজনানুসারে যার অদলবদল করবারও অধিকার ছিল না কারো। প্রৌঢ়ত্বে যেদিন ধোঁয়াধূলার মাঝে পা দিল সতীশ সেদিনই ফিরে যেতে চেয়েছিল গাঁয়ে। উপায় ছিল না। সেদিনই বুঝেছিল গাঁয়ের বুকে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে চলে আসার পরও গ্রামের থেকে দূরে এসেও গ্রামকে অন্তর্লোক থেকে ছেটে ফেলে দিতে পারে নি। বহু পুরুষের অর্জিত সংস্কার আর অভ্যাস, রুচি এবং কৃষ্টি সব কিছুকেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। বারবার মনে হয়েছে, তবুও আঁকড়ে ধরেছে দ্বিগুণ বলে। ফলে নতুনের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার খিটিমিটি নিয়েই কেটেছে। বস্তীতে একই চালের তলায় বাস করেও বালেশ্বরের বনমালী বা তেলেঙ্গানার কিষ্টো কারো সঙ্গে প্রতিবেশী সুলভ মন নিয়ে আলাপ জমাতে পারে নি, চেষ্টাও করেনি; বরং মনের মধ্যে বেলকাঁটার মত সঘৃণভাব সর্বদাই উচিয়ে থেকেছে আঘাতের জন্য আবার দূর গ্রাম থেকে যখনই কোন চাষা ভাই কাস্তেতে পুঁড়ি দিতে এসেছে বা বেচাকেনা সেরে একটা নতুন সাড়াশীর ফরমাশ দিতে ঢুকেছে সতীশের মনের বন্ধদ্বার আপনা থেকেই খুলে গেছে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য—যেন কত আপন জন কত পরিচিত।

শহরের সঙ্গে আপোশ রফা কোনদিনই হয় নি সতীশের; আবার গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর যোগ সূত্রটাও বজায় থাকে নি। সতীশ এখন গ্রামেরও নয় শহরেরও নয়। সতীশের মনে গ্রাম বাংলার যে ছবি আছে তার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যায় নি, যায় নি পঞ্চাশের মন্বন্তর দাঙ্গা দেশভাগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবছর পরেই ঘর ছেড়েছিল সতীশ আকালের পরের বছর। সে আর কী আকাল—

আকালের যে রূপ এই টিটাগড়ে বসেই পঞ্চাশ সালে দেখেছে তার কোথায় তুলনা! মানুষগুলো মরেছে আগুণে পড়া পিঁপড়ের মত। মৃতা মায়ের স্তনেমুখ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছে বাচ্চা শিশুকে খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে।

গ্রামের জীবনেও নাকি অনেক পরিবর্তন এসেছে। খড়ের জায়গায় টালি উঠছে লোকের ঘরে—ঐটাই কম খরচ এখন। পথের মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান—গরুর গাড়ীর ভীড় কমে গেছে হাট বাজারে। লরীর মিছিল। দুহাতে ছিনিয়ে নিচ্ছে গ্রামের পয়সা। পঞ্চাশ বছর আগেকার সে গ্রামকে আজ নাকি আর চেনা যাবে না। সে মানুষ নেই—চিন্তার ধারা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভাবছে লোকে আবার নতুন করে নতুন ভাবে। বাঁচা এবং বাঁচানর চিন্তাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সতীশ এসব খবর লোকের মুখেই শোনে। শুনে আজব বনে যায়, হাতের কাজ থেমে যায়, বুকের স্পন্দনও যেন অলস হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই একরাশ খিস্তি করে মনে মনে। লোকটা বেবাক গাল-গল্প করে গেল খানিক। সতীশের কাছে আজকের খবর গাঁজাখুরী গালগল্প ছাড়া কিছু নয়।

সতীশকে রকে খেতে দিছল বাদলী। অন্যদিন ঘরেই দেয়। ঘরটা পরিষ্কার করছিল ঝুল ঝাড়ছিল। জিনিষ পত্র সব মেঝেয় জড় করা। সতীশকে খাইয়ে নিয়ে গোছাবে সেগুলো।

দোকান ঘরের খোলা দরজার আলোই ওর দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেল সেদিকে। এ সময় বাইরের দোর খোলা থাকবার কথা নয়। খেতে যাবার সময় কানাই ওটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই। সতীশ খাচ্ছে এক ফাঁকে বাদলী দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আসবার জন্যে গেল। সতীশ দোর খোলা দেখলে একচোট হৈ চৈ করবে তাছাড়া পথের ধারের দোর—কে কখন ঢুকে কোনটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে তার ঠিক কা!

ঘরে ঢুকে বাদলী কানাইকে দেখে থেমে যায়। বলে, কী আপনি খেতে যান নি। আমি ভাবলাম দোরটা দিয়ে যেতে ভুলে গেছেন বুঝি, তাই দিতে এলাম।

কানাই আরো কয়েকটা ঝাল ছোলা গালে ফেলে বলল, আমি ত সকালে খেয়ে আসি।

অত সকালে রান্না হয়?

পান্তা।

ও! ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাদলী।

পান্তাভাত কতটুকু সময় পেটে থাকে! কাক ডাকার আগে খেয়ে বেরোয় বাড়ী ফেরে দুপহর রাতে—দু তিন কাপ চা আর ঐ ঝালছোলা!

অসম্ভব। মানুষের শরীর—লোহা নয়। আর লোহা হলেই বা। যুদ্ধ করতে করতে ছেনীর মুখও ভোঁতা হয়ে যায়।

খেতে বসে খেতে পারে না বাদলী। ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে। একটা পুরুষ মানুষ বাইরে পড়ে রয়েছে না খেয়ে, কোন মেয়ের মুখে ভাত রোচে! বাদলীর ত রোচে না

সেদিন রাতে তেল মালিশ করতে করতে কথাটা বলেই ফেলল সতীশকে, কানাই বোধ হয় সারাদিন না খেয়ে থাকে বাবা।

না খেয়ে থাকে! সোজা হয়ে শুতে চেষ্টা করে সতীশ। মেয়ের দিকে তাকায়। বলে চলে, তাইতে কাজ কর্ম তেমন এগোয় না। আমি বলি শালার কাজ কেন এগোয় না! পেট চুঁই চুঁই করলে কী আর কাজে মন বসে। এখেনে ওসব চলবে না—দাম দোব ষোল আনা কাজও চাই ষোল আনা! দম নেবার জন্য থামে সতীশ। কাশে। এক ধাবড়া গয়ার ছাই এর সরাটায় ফেলে আবার বলতে আরম্ভ করে, ও খিষ্টানী মত আমার এখেনে চলবে না বলে দিবি বাদলী, না খেয়ে আমার দোরে পড়ে থেকে আমার সংসারের অকল্যেণ! আমার খেয়ে আমারই সর্বনাশ! মা বলত গেরস্ত

বাড়ীতে এই কুকুর বেড়ালও যদি উপুষী থাকে ত সে ভিটেয় ঘুঘু চরে। আচ্ছা আপদে পড়া গেল যা হোক, ও শালাদের ভালো করতে যাওয়াই ঝকমারী। ছাখ বাদলী, তখনই বলেছিলাম ও রিপুজীর জাত তুই চিনিস না, যার খাবে তার চামড়ায়ই ডুগডুগী তৈরী করবার তাল খুঁজবে!

বর্ষার মেঘের মত ক্ষণিকের বর্ষণক্ষান্তি শুধু দ্বিগুণ ধারায় বর্ষণের প্রস্তুতি। খানিকটা গুম হয়ে থাকে সতীশ। তারপর, এ আমি জানতাম, সতীশ আরম্ভ করে, খাবে কোথা থেকে। রোজগার ত ঐ দেড়টি টাকা। দেখগে যা সাতগুষ্টি ঐ ছোঁড়ার পয়সা ক'গণ্ডার পথ চেয়ে বসে রয়েছে। খাট না সবাই—খেটে খা-না। তা নয় এখনো মান কোলে করে বসে বসে পুত্তুরশোকের প্যানপ্যানানী! কাজ না পাস দল বেঁধে কেড়ে খা—না কী তাও পারিস না! উপোষ করে মরার চেয়েও কী শক্ত সেটা? আবার থামে। গলায় একদলা সর্দি উৎপাত করছে। ওকে কালই তুই বলে দিবি বাদলী ওসব এ বাড়ীতে চলবে না—এটা হিঁদুর বাড়ী। শালা আমার কৈবত্ত—কৈবত্তই হও আর বাপের গুরুঠাকুরই হও এই সতে বাগের কাছে খাতির নেই কোন শালার! হয় দুপুরে সতে বাগের হাঁড়ীর নূন-ভাত খাবে আর নয় ত নিকাল যাও হারামী কা বাচ্চা! হাতটা বাতাসে ছুড়ে দেয় সতীশ। যেন এখুনি কানাইএর ঘাড় ধরে বার করে দিল। গলার সুরটা নরম করে বলল, কত শালার বামুন সতীশ বাগের হাঁড়ীর ভাত মেরে গেল আর—

আন্দারমানের ডাক অইছে—আজ কেষ্টবাবু কতিল বুইলা কানায়ের মা। তামাক টানতে টানতেই বলল দীনবন্ধু।

কানাই বসে বসে দা দিয়ে নারকোলের মালা চাঁচতে চাঁচতে

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে মন দিল। আন্দামানের ডাকের চেয়ে লবণের মালাটাকে সুন্দর করে তোলাই বড় ব্যাপার তার কাছে যেন।

সারদাও কোন কথা বলল না। কেবল আড়চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকাল একবার, অবলম্বন খুঁজল হয়ত বা।

হারাণ কোবরেজ নাম দিল, আজ সাত লম্বরের পুঁটিরাম মণ্ডলও দিল। বুড়েধুড়োগো নিতি চায় না। ত্যাবে ফ্যামিলতি জোয়ান মদ্দ থাকলি—ছবি ছ্যাকচস্ কানায়ের মা—অপিসে লটকাইচে, আন্দারমানের ছবি। কত্তিল বাবুরাও—মাছ আর নারকোলের ছড়াছড়ি আন্দারমানে, ও নাকি লোকে খরিদই করে না। খাদ্যখাদকেরও নাকী খুব বোলাবোল। দেবেও অনেক—এক বচ্ছর ডোল দেবে—আমাগো রমলাও পুরো ডোল পাবে। আমাদের ফেমিলে ধর তোর চারজন মেয়ে পুরষে—মাসে ষাট ট্যাহা ডোল। আরো সব কত কী দেবে কত্তিল বাবুরা। নামডা দে দিতে গে-ও দিতি পারলাম না।

একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কানায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল দীনবন্ধু, তুই কী কস্ কানাই নামডা দে থোব?

আন্দামানে যাব মরতে! দৃঢ়স্বরেই বলল কানাই। আন্দামানে সেত মানুষ খুন করে—কাকে খুন করিচি যে আন্দামানে যাব?

বলল বটে বুকের মধ্যে অনেকগুলো কথা তোলা আছাড় খেতে লাগল। জায়গা পাওয়া যাবে, জমি পাওয়া যাবে—শিয়ালদা প্লাট-ফরম ছেড়ে পাওয়া যাবে নিজের ঘর, নিজের হাল নিজের বলদ। এক বছর ধরে পাওয়া যাবে দিন চালাবার মত ক্যাশডোল। সবচেয়ে বড় কথা সুখ হোক দুঃখ হোক পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যাবে যে মাটি নিজের। সব পাওয়া গেলেও একটা কিন্তু থেকে যায়। বাদলীর কী হবে? বাদলীকে ত সঙ্গে পাবে না।

দা-মালা ফেলে উঠে পড়ে কানাই। বসে থাকতে পারে না!

কখন যে মনের তলে তলে বাদলী গুছিয়ে বসেছে জানতেও পারে নি কানাই—হয়ত এত তাড়াতাড়ি পারতও না যদি আসন্ন বিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা না থাকত।

সতীশ বেকার। কানাই কাজে ঢোকার পর থেকে প্রায় বেকার বসে বসে তামাক পোড়ায় আর কাশে—কাশে আর ছাইয়ের সরায় গয়ার ফেলে। গজ গজ করে। নিজেকেই শোনায়। স্মৃতির গিলিতচর্বণ করে অনর্গল। কী ছিল তাদের আমলে আর কী নেই আজকাল। মানুষ কী আর মানুষ আছে এখন। বেইমান আর বেইমানী—ঘোর কলিকাল একেই বলে। সাত রাজ্যের ভাঙ্গা পাত্র আর কুটোর জঞ্জাল ভরে গেছে পৃথিবীতে। মরচে পড়া লোহার মত হাল হয়েছে পৃথিবীর। গণগণে আগুণে একবার জ্বালিয়ে না নিলে অকেজোই পড়ে থাকবে। একটা করে দিন যাচ্ছে আর মানুষের মধ্যে থেকে একপোঁচ করে ইমানদারী বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

নয়ত বংশী এমন করে।

বাদলীর বিয়ে কী আটকে থাকত এ্যাদ্দিন? এখন কা আর লোহা-লক্কড় আর হাজার কিসমের খদ্দের নিয়ে ফেরেপবাজা করার বয়েস আছে সতীশের! ফেরেপবাজী বই কী—কথাটার ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে সতীশ—ব্যবসা ফেরেপবাজী ছাড়া কা? বাদলীর বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দিতে পারলে বুঝত সতীশ—ব্যবসার মাথায় ঝাঁটা মেরে নবদ্বীপ নয়ত কাশী গিয়ে বাকী কটা দিন একটু ভগবানের বেগার দিয়ে দিত। তা হবে কী করে! কপালে রয়েছে এই ফলবাজারের নরকে পড়ে নর্দমার খোসবাই শোঁকা! এঁটোকুড়ের পাত যাবে স্বগ্‌গে! সে যে যাবার চলে গেছে। সতী-লক্ষ্মী মানুষ ছিল, গালভর্তি দাঁতে পান খেতে খেতে কলা দেখিয়ে চলে গেছে—এখন মর ব্যাটা তুই বাগের পো!

ছেলেবেলায় মা বলত, ছাখ সতে পরের থালায় ভাত মাথায় পরের ছাত—কোন ভরষা নেই! এমন বেদবাক্যি কী আর মিথ্যে হয়! আমি শালার যেমন বুদ্ধু—সাতকাল খুইয়ে চানকের ঘাটে পৌঁছে চুলিতে চড়েও খুঁজতে গেলাম আরাম—ভগবান ব্যাটাও থোবনায় লাথি মেরে দিলে এক যম গত্তয় ফেলে! বংশীর দোষ কী—ভগবান ব্যাটাই ওকে দিয়ে আমার সুখের ঘড়া সবকটা পুরো করিয়ে ছেড়েছে!

কানাই এর সাহস হয় না কোন মন্তব্য করতে। বুড়োর ধাত-গোড়েন এখনো ঠিক রপ্ত করতে পারেনি কানাই। কখন যে খ্যাঁক করে ওঠে কে জানে! তবে বাদলী ছাড়ে না; কোনদিন হয়ত চায়ের গ্লাস নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে একমুখ হেসে বলল, এক কাজ কর বাবা, কাল সকালে যার মুখ ঘুম থেকে উঠে দেখবে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও।

সে শালার দিনও আর নেই। জোয়ানমদ্দ সব বিয়ের নামে যেন আটাশে বাচ্চার মত ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে! বিয়ে হলে যেন বাঘ ভল্লুক নিয়ে ঘর করতে হবে! মানুষ তুই কারে বলিস বাদলী—সব শালা ডরপুক নচ্ছার!

বাদলী হাসে। চকিতে একবার তাকায় কানায়ের দিকে। চোখ নামিয়ে নেয় তুজনেই তুজনের কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জায়। চায়ের গ্লাস নামিয়ে দিয়েও চলে যায় না বাদলী। কানাই দমাদম তুচার হাতুড়ী হাঁকায় গণগণে আগুণ থেকে রগরগে লাল লোহাটা টেনে নে ছাইয়ের উপর চেপে ধরে, হাতুড়ী আর লোহার হুংকার ও আর্তনাদ কত কথা হয়ে বাদলীর কানে ঢোকে।

হয়ত কানায়ের লজ্জাটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই বলল বাদলী—লোহাটা একটু পরে পেটালেও চলবে চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর আধ ঘণ্টার মধ্যে গরম হবে না, ভাত চেপেছে তা বলে দিলাম কিন্তু।

ঐ তো ! দোষ কী একটা—ফোঁস করে ওঠে সতীশ—কখন যে কোন কাজটা করতে হবে জানে না বলেই না এত দুর্দশা মনিষ্যির ! চা ঠাণ্ডা হতে লাগল ও পিটুচ্ছে লোহা ! ব্যাটার রোজগার খাবার বয়েসে এদেরই সব খেয়াল হয় এয্যা বিয়েটা ত করা হয়নি ! ও একই কথা—ঐ চা থেকেই আসল মানুষটাকে চিনে নিতে পারি। আর জীবনভোর ঠকিনি ত—ঐ এক হারামীর বাচ্চা বংশী ছাড়া। উঃ শালা আমায় পথে বসিয়ে গেছে !

বাদলীর মনটাও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে কথা মনে হলেই টাকা কী একটা দুটো—বুড়ো বয়সের হাড় হিম করে রোজগার করা পয়সা। একবারও মনে সন্দেহ হয়নি বাদলীর যে বংশী এমন কাজটা করবে বা করতে পারে। হাসি মুখে ঠাট্টা তামাসা লেগেই ছিল লোকটার—মন কখনো খারাপ হতে দেখেনি তার, সেই মনেই যে এমন প্যাঁচ এমন শয়তানী লুকিয়ে আছে লোকে বুঝবেই বা কী করে। দুনিয়ায় ত তাহলে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। অথচ এই বংশীর ওপরই একদিন বাদলী কত ভরষা করেছিল। তিল তিল করে নিজের মনটাকে তার কত কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। বাড়ীরই একজন অবিচ্ছেদ্য মানুষ করে নিছল বংশীকে—নিজেরও যেন ওকে ছাড়া দিন চলতে পারে না এমনই মনে হয়েছিল। অন্ধকার শয্যায় কতদিন মনে মনে ঐ বংশীর হাত ধরেই সে চলে যেত দূরে, বহুদূরে। চলে যেত খোলার ঘর ছাড়িয়ে, বস্তী পার হয়ে, সংসারের সকল সীমানা ডিঙিয়ে, সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে এক নূতন রাজ্যে—দিনে দিনে বিন্দু বিন্দু মনের মধু দিয়ে গড়ে তোলা সে এক সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বাদলী নিজে। সে সময় আর কারো কথা মনে থাকত না বাদলীর। সে আর বংশী। বিশ্বকর্মা যেন নিরবধি কাল ধরে অমিত মনোযোগ দিয়ে স্বকীয় অলৌকিক নৈপুণ্য প্রয়োগ করেছে শুধু এই দুজনকে সৃষ্টি করতেই। বিশ্বকর্মারই সৃষ্টি যেন ওদের দুজনকে সৃষ্টি করবার জন্য !

বাদলী ভুলে যেত অথর্বপ্রায় জরাজীর্ণ সতীশের কথাও। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত বাদলী। সেই স্বপনপুরীর একমাত্র পুরুষ বংশী সাত সাগর আর তেরো নদী পারের রাজকুমার।

এখনো দূরে কোন খুপরীতে হয়ত কারো ছোট বাচ্চা মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে বিরক্তি এবং অভিমানে ডুকরে কেঁদে ওঠে, গভীর রাতের ঘুম ভেঙ্গে অন্যমনস্ক হয়ে যায় বাদলী। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুপুষ্ট যৌবনকঠিন স্তন তার পাষাণ কারায় বন্দী নির্ঝরের মত গুমরে ওঠে! কী যেন চেয়েছিল কী যেন নেই—যা নেই তা থাকতে পারত—এমনই এক অনির্দিষ্ট রূপক অনুভূতি বুকের মধ্যে জেগে উঠে উদাস করে দেয় বাদলীকে। দুচোখ ভরে জল আসে নির্জন অন্ধকার শয্যায়—অভিমানে। সমাজ, সংসার, ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট কিছুর ওপর নয় এ অভিমান—এ অভিমান হয়ত নিজের যৌবনের ওপরই। বাইশ বছরের নিঃসঙ্গ যৌবন, অবহেলিত মধুভাণ্ড বিষাক্ত হয়ে উঠেছে কখন! সেই যৌবন-বিষের জ্বালায় এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই বংশীকে সে চেয়েছিল—সমগ্র দেহ-মন দিয়েই চেয়েছিল। এতবড় নিষ্ঠুর সত্যটা বংশী পালাবার আগে পর্যন্ত সে হয়ত নিজের কাছেও জোর করে স্বীকার করতে পারে নি। স্বীকার করে নি—হতে পারে অহেতুক জেদ অথবা নারীসম্ভব রমণীয় সংস্কার-বশে। কিন্তু এখন সেই সত্যই উলঙ্গ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সুমুখে। এ নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করা যায় না। মাঝে মাঝে উদ্দেশ্য-হীন ছন্নছাড়া ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে। আঁতিপাঁতি করে বংশীকে খোঁজে, পায়ও। কিন্তু এ পাওয়ার মাঝে আগেকার সেই পাওয়া-না-চাওয়া আর চাওয়া-না-পাওয়ার লুকোচুরি খেলার আনন্দ নেই! পুরুষকে কেন্দ্র করে নারীমনে যে মধুচক্রের সৃষ্টি হয় তাকে আবিষ্কার করতে পারার সুখদ সলজ্জ পুলক নেই আছে শুধু হতাশায় ভরা ক্লান্ত গ্লানি। ম্লান অন্তরের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে বাদলী তেমন করে

আর নিজের মনের প্রতিবিম্বকে দেখতে পায়নি—দেখতে পেলেও সে-মনের প্রতিবিম্বকে দেখেনি। বংশীর কথা মনে হলেই নিজেকেও অপরাধী মনে হয় কারণ বংশী ছিল তার মনের নিকটতম আত্মীয়! যৌবনের চোখ ভরে দেখা প্রথম পুরুষ।

তবু আজ অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে বংশীকে। মনের থেকে অনেক দূরে। নির্জন নিঃসঙ্গ প্রহরে এসে তার স্মৃতি খানিক হয়ত খেলা করে বাদলীর সঙ্গে কিন্তু যখনই ঐ উনআশী টাকা, আর নাকছাবির কথা মনে হয় ঘৃণায় ওর স্মৃতিচারণ থেকে ফিরে আসে বাদলী। ফিরে আসে কানাইয়ের কাছে। হাওয়ায় হাত বাড়ায় ওকে স্পর্শ করতে—স্পর্শ করে মনের সুকুমার পরিচর্যায় কান্তিমান কানাই এর মনকে আপন মননের মরমীয়া মাধুরী দিয়ে। সেখানে বাদলী আর কানাই একাকার, একাত্ম, অভিন্ন। কানাই সেখানে কন্দর্প।

ওর কথাগুলো বেশ—মাঝে মাঝে হাসি লাগে বাদলীর। দেশের ভাষা প্রায় ভুলেছে, মাঝে মাঝে দু'একটা ফস্কে বেরিয়ে যায়—আর ঐ চ আর স এর টানগুলো এখনো পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি। চিনিকে এখনো বলে চেনি। হাসি পায় না শুনলে?

হাসির কথাও বলে বেশ।

ভাবতে গিয়ে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে বাদলী। আর দিনকার দিন অসভ্যও হয়ে উঠেছে ছাখ না! পুরুষ মানুষগুলোই ঐরকম। লজ্জা-সরম এর বালাই নেই!

আজকাল ওকে খেতে দেয় পরে। সতীশ খেতে বসে এত বকর বকর করে যে বেচারার খাওয়া হয় না ভাল করে। আর বাদলীও ধীরে-সুস্থে খাওয়াবে তারও উপায় থাকে না। যতই হোক পরের বাড়ী—কানাই ত আর সত্যিই বাড়ীর মানুষ নয়—সতীশ যে রকম এটা খাও, ওটা দে করে ওকে খেতে জবরদস্তী করে তাতে করে ইচ্ছে থাকলেও মানুষ আর দুটি বেশী ভাত কী এক হাতা আলু পটলের

তরকারী নিতে পারে না। নির্বাক আবদার করে খাওয়ান—ও পুরুষের কর্ম নয়।

তাছাড়া আজকাল বাবুর মুখটি যা হয়েছে—ভয় বাদলীর, কোন-দিন সতীশের সুমুখেই না কিছু বলে বসে। এইত সেদিনের কথা—

দেখি হাতুড়ীটা।

জোর করে ওর হাত থেকে হাতুড়ীটা টেনে নেয় বাদলী।

দাও দাও—বেশী নয় এই ঘাতুই মেরেই উঠে পড়ব। কই দাও কড়ে যাচ্ছে লোহাটা। ওর মুখের দিকে চেয়ে বলতে বলতে হেসে ফেলে কানাই।

চুলোর দোয়রে যাক গে—ভাতগুলো যে এদিকে আবার চাল হয়ে গেল। কখন থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর করছি বাবুর আর নড়বার নাম নেই! পাবে না হাতুড়ী। লোহা আগুণে গুঁজে দিয়ে আমায় ছুটি দাও দিকিন।

বেশ, যাও তোমার ছুটি। দাও এবার হাতুড়ী। হাত বাড়ায় কানাই। হাসতে হাসতেই ঘাম মোছে কপালের।

নাও! ওর সুমুখে হাতুড়ীটা ছুড়ে ফেলে দেয় বাদলী। হাপরের পাশে জমা করা ছাইয়ের স্তূপ থেকে একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে কানাইয়ের সুমুখে দাঁড়িয়ে শাসায়, বেশ, খাবোও না খেতেও দোব না কাউকে। ঐ ভাতে যদি ছাই না ফেলে দিই ত—

কথা শেষ না করেই তুপদাপ পা বাড়ায় বাদলী।

পিছন পিছন উঠে যায় কানাই।

দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি। আরে এ-যে থামে না—এবার কিন্তু আঁচল ধরে টানব তখন দোষ দিতে পারবে না বলে দিলাম। ধরলাম—হাত বাড়ায় কানাই।

হেসে ফেলে বাদলী। ঘুরে দাঁড়ায়।

সাহস যে বড় বেড়ে গেছে দেখছি।

এই দেখলে ত—তবু আঁচল ধরিনি, ধরলে না জানি—

মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে বাদলীর।

মুখে আর কিছু আটকায় না আজকাল। কপট তিরস্কার করে কানাইকে। মনের মধ্যে খুশীর জোয়ার উঠেছে তখন। জীবনের জট যেন খুলছে ধীরে ধীরে। স্বর্ণসূত্রের হারানো খেই যেন ধরা দেয়-দেয় মনে হয়।

যাও টিনে জল তোলা আছে—মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে এস। ভাত বাড়ছি—খবরদার দেরী হয় না যেন।

পাগল হয়েছ! আবার দেরী—জানের ভয় নেই!

চলে যায় কানাই। গামছাটা তারের ওপর থেকে টেনে নেয়।

বাদলী রান্নাঘরে ঢোকে। ভাত বাড়তে বাড়তে সে যেন অন্য কোথায়—অন্য কোনখানে চলে যায়। মনকে কিছুতেই আর স্ববশে রাখতে পারে না। কানাই যেন ওকে গুণ করেছে! পাগল করে তুলেছে বৃষ্টি দিনের এক ঝলক পূবে হাওয়ার মত ঐ পূবদেশের মানুষটি!

কানাইকে দেখলে আজ আর বোঝবার উপায় নেই যে ও সেই মুখচোরা কানাই—প্রথম দিন এসে কী নাস্তানাবুদই না হয়েছিল। কথায় খই ফোটাচ্ছে যেন—কদিন ধরেই দেখছে বাদলী; সারাদিন লোহার সঙ্গে লোহা হয়ে গিয়েও তার স্ফূর্তির কামাই নেই। নিত্য নূতন খুশীর খোরাক জুগিয়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায়—তখনো ত আপনি-আজ্ঞেতেই ঠেকে ছিল ওরা—টিমটিমে ল্যাম্পের আলোয় বসে হাত ধুচ্ছিল কানাই। দু'হাতে কালি মাখামাখি। জল ঢালবার অসুবিধা। বাদলী পাশে এসে দাঁড়াল। ওর হাত ধোয়ার বহর দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, আহা, কী হাত ধোয়াই হচ্ছে, ওর চেয়ে বাতাসে ধুলেই হত।

যা দিয়ে হয় ধুলেই হল—চোখের জলে আর ধুইয়ে দিচ্ছে কে! বলেই মুখটা অবশ্য নীচু করে নিয়েছিল কানাই। উত্তেজনায় কান

পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল বাদলীর—ধূলো-জমা বাদ্যবৃন্দ একসঙ্গে বাদলীর বুকে সুমিষ্ট ঐকতানে ঝংকার তুলেছিল। চেখের পলকে সামলে নেয় নিজেকে, ও ব্বাবা আজকাল বেশ বোল ফুটেছে দেখছি। পেটে পেটে এত? সহজ হতে চায় বাদলী। মিটমিট করে হাসে। বলে, এত বাক্যিব্যয় না করে ডেকে দেখলেই হত।

কানাই চকিতে ওর মুখটা একবার দেখে নিয়ে হাত ধুতে থাকে।

খুব হয়েছে দেখি মগটা। ওর হাত থেকে মগটা নিয়ে হেঁট হয়ে ওর হাতে জল ঢেলে দিল সে। এলো চুলের রাশ পিছলে পড়ে, বাঁহাত দিয়ে মাথার পিছনে ঠেলে দেয়। ওরই মাঝে নিজেকে বকুনি দেয় সময়মত চুলগুলো বেঁধে ফেলতে না পারার জন্য।

দোরটা বন্ধ করে দিও—যাচ্ছি! অন্যদিন সোজা পথে নামে। সেদিন কেন জানি তার পা চলল না। দাঁড়িয়ে রইল! ল্যাম্পো হাতে বাদলী এসে দাড়াল ওর সুমুখে। সেই সব-গোলমাল করা হাসি। না, আর নয় হয়ত আবার কী বলে বসবে বাদলী। আর মুখ কানাইয়েরও ভাল নয়—ক্যানভাসারের মুখ কখন কী বেরিয়ে যায় তার ঠিক কী।

পথে নেমেও পিছনে তাকায় কানাই। কে যেন তার ঘাড় ধরে পিছনে ঘুরিযে দেয়। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করে—না এখন আর ফিরবে না। কোন কাজের জন্য ডাকলেও না। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলাটায় যে কী হয়ে গেল!

লাইটপোষ্টটা পার হয়ে বেঁকবার আগে পিছনে ফিরল কানাই—তখনো বাদলী ল্যাম্পো হাতে দোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোড় বেঁকে গেল কানাই।

মোড় বেঁকেই মনে হল ঘটনাটা। আগাগোড়া পর্যালোচনা করতে সুরু করল। সেদিনও ত যে ব্যাভারটা করল—এতটা না হলেও—দোষ ত বাদলীরই! পুরুষ মানষের মন কখন কী গাইতে কী সুর ধরে বসে ঠিক কী।

কানাই নামটা কে রেখেছিল আপনার? জিগ্যেস করে বাদলী।

কানাই বোকার মত একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কে আর অত খোঁজ করছে। জিগ্যেস করব'খন মাকে।

থাক, আর জিগ্যেস করতে হবে না। হেসেছিল বাদলী। তবে আপনার নাম রাখা উচিত ছিল রা-নাই।

বুঝতে না পেরে কানাই ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে না বাদলীর বক্তব্য। স্থূল রসিকতার আঞ্চলিক ইঙ্গিতটুকু ধরতে পারে না।

একটার বেশী দুটো কথা বলতে হলে যার তিনবার ঢোক গিলতে হয় তার নাম কানাই—মরে যাই—মরে যাই! ঠোঁট উল্টেছিল বাদলী।

মরে যেতে ইচ্ছেটা হয়েছিল কানাইএরই। সেদিন চুপ করেছিল। আজ উশুল। মনে মনে সম্ভাব্য কথোপকথনের মহড়া দেয় কানাই! নিজেই বাদলীর হয়ে বলে উত্তরটাও দেয় সে-ই। মনের মত না হলে শুধরে নেয়।

যদি হঠাৎ কাল সকালে বলে বসে, কাল ওকথা বললেন কেন?

টপ করে উত্তর দিয়ে দেবে, ঐটুকু শোনবার জন্যেই ত চুলবুল করছিলে। না—এতটা ভাল নয়—সাতদিন ধরে ঘুরঘুর করছিলে! এখন কেমন?

হয়ত এরপর বলবে, বড্ড বেড়ে উঠেছেন—না না ওকথা কী এরপর বলে না কী কেউ! বড়জোর বলবে, অতটা বাড় ভাল নয়।

কানাইএর ত এর উত্তরও তৈরী। আহা এটুকু যদি একদিন আগে বুঝতে। এখন আর ও নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লাভ কী?

এরপর রেগে মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও হেসে ফেলবে বাদলী।

আবার নতুন করে নতুন কল্পনার মালা গাঁথে কানাই। ট্রেনে উঠে লজেন্সের বয়েমটা খুলতে খুলতে সব ভুলে যায়। এখন তার মন জুড়ে, আনায় আটখানা টকমিষ্টি·········

গাড়ীভর্তি মানুষ। এদের সমষ্টিকে চেনে কানাই। বড় আপন করে চেনে। বড় নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে চাকার আওয়াজ, ওদের নিজ নিজ কথা আর ওর মনের ধুকধুকুনীর সমাহারে।

আলোর কাচে কটা নীল রংয়ের পোকা মাথা কুটছে।

আলোর কাছে পৌঁছাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না!

তামাকে দ্রুত টান দেয় দীনবন্ধু তখনই যখন জটিল কোন চিন্তা তার মনে জট পাকায়। সমস্যা সমাধানে সম্ভবতঃ তামাকের ধোঁয়ার মত সাহায্যকারী কোন রসায়ন এপর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। চিন্তার স্বচ্ছতায় তামাকের জুড়ি নেই।

তামাক টানছিল দীনবন্ধু। তুচোয়াল হাপরের মত ফুলছিল আর চুপসে যাচ্ছিল আবার ফুলছিল। কানাইএর মা গেছে ওদিকে। তিরনাথ বর্মনের শীটে। আন্দামানে নাম দিয়ে এসেছে ত্রিনাথ। কেউ কেউ আবার মধ্যপ্রদেশে। নাম দিয়ে অপেক্ষা করছে।

সারদা গেছে তিরনাথের বৌএর সঙ্গে দেখা করতে। বৌটা কাঁদছে বসে বসে। বাপ-মা ভাইবোন কারো সঙ্গে আর দেখা হবে না কোনদিন। সাগর পার হয়ে যেতে হবে—কালাপানি। খুন করে লোকে যেত যে কালাপানিতে। ফিরত না—শোনা আছে কাউকে নাকি ফিরতে দিত না। কত গল্পও শুনেছে কালাপানির। ঐ আন্দামানের। জলে আঁশ নেই—বড় বড় কী মাছ এসে জাহাজ আটকায়। তাদের খেতে দিতে হয়— জাহাজে ছাগলের মাংস নিয়ে যায় সেজন্য। কিন্তু কম পড়লে—এই শিয়ালদায় বসে শুনেছে— মানুষ নামিয়ে দেয়—খেয়ে চলে যায় মাছ। খানিকটা পথ জাহাজ যখন জলের মধ্য দিয়ে যায়—কত লোক ত দমবন্ধ হয়েই মারা যায়। জলের তলায় মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে! আর জাহাজ? ও ত যখন তখন ডুবতে পারে।

ছোট বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে শুইয়ে নিয়েছে ত্রিনাথের বৌ। চোখ মুচছে। বড় মেয়েটা বছর পাঁচেক বয়েস হবে জিগ্যেস করছে, কাঁনছিস ক্যান মা—অ-মা কাঁনছিস ক্যান?

কাঁদছে সেও।

দেখেশুনে এসে তামাকটা ধরিয়েছে দীনবন্ধু। কেঁদে ভাসাবার আছে কী? ভেবে পায় না দীনবন্ধু। মেয়ে মানুষ নে ঘর করা নয়ত। ও শালার শেঁকুল কাঁটার ঝোপ। ভাবনাচিন্তায় মানষের এক একদিন এক এক বছরের পেরমাই চলে যাচ্ছে তার ওপর ঐ ঘ্যানর ঘ্যানর প্যানর প্যানর—শালা সাধে কী আর বলে দশহাত কাপড়েও ওজাত ন্যাংটা।

গলগল করে ধোঁয়ার বুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে দীনবন্ধু ভাবে। আকাশ-পাতাল ভাবে। আর একটা দিন মাত্র হাতে। বরাবর ওর চাষী কার্ড—জীবন গেল চাষ আবাদ করে আর বাবুরা কি না বলল, তুমি আন্দামানে চাষ করতে পারবে না দীনবন্ধু। বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষ মাটির বত্রিশ নাড়া কেটে সেই মান্ধাতার যুগ থেকে ফসল টেনে বার করে এসেছে আর দীনবন্ধু আজ চাষ করে খেতে পারবে না। বাবুরা ঠাউরেছে কা! দীনবন্ধু চাষ করতে পারবে না, পারবে ঐ তিরনাথ বর্মন—যার শরীর থেকে এখনো আঁশটে গন্ধ যায় নি। যাদের ঘরে বাচ্চা জন্মায় হাতে জালটানা কড়া নিয়ে। বাবুরা মজেছে ওর লাউপানা চেহারাখানা দেখে—সে কী আর বোঝে না দীনবন্ধু, খুব বোঝে। তিরনাথ, মহিন্দির কাপালী, ললিত পাল, সুরেন হালদার, বিমল হালদার, সমাদ্দারেরা তিনভাই—সব ব্যাটার আছিল এস্ টি কার্ড। তিনচার বার গরমেণ্টের লোন খেয়েছে। এখন জাল মাইগ্রেশন কিনে সব হয়ে গেছে চাষী। ওর চাষ বসে খাবে আন্দামানে। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাউর।

কালকের দিনটা হাতে আছে। কানাই এলে ব্যবস্থা যা হয় করতেই হবে। বাবুরা দেখতে চেয়েছে কানাইকে। কানাইকে

দেখে যদি পছন্দ হয়। আন্দামানে চাষ করে খেতে পারবে মনে হয় তবেই নেবে দীনবন্ধুর ফ্যামিলি ; নয়ত ঐ পর্যন্তই। আবার কতদিন পরে কোথাকার ডাক হবে কে জানে! মধ্য প্রদেশের দলের যেতে দেরী আছে। যাদের আন্দামানের দলে নাম নিয়েছে তারা লেগে গেছে ফলফুলুরির বীজ সংগ্রহ করতে। দুচারদিনের মধ্যেই নিয়ে যাবে কাশীপুর ট্রানসিট ক্যাম্পে—সেখান থেকে সোজা খিদিরপুরে। জাহাজে।

ছটফট করে দীনবন্ধু। কখন ফিরবে কানাই। সারদা নিমরাজী। আর ও রাজী হল না হল বড় বয়েই গেল দীনবন্ধুর। ও ত আর তিরনাথ বর্মন বা শরত বিশ্বাস নয় যে মাগের কান্নার ভয়ে বাইরে বাইরে ঘুরবে। কাঁদছে শরত বিশ্বাসের বৌটাও। এ্যাদ্দিন এ কান্না কোথায় ছিল ভেবে পায়না দীনবন্ধু। অদ্দিন উড়িষ্যায় পাশাপাশি বাস করে এল অথচ দীনবন্ধুকে কী না লুকোলেই চলত না? আর দীনবন্ধু কী কচিখোকা যে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না? মেয়ে বেরিয়ে গেছে বলতে ভদ্দর লোকের লজ্জা হচ্ছিল। এখন যে বৌ-মাগী চেঁচিয়ে চিকড়ে কেঁদে সারা কলকাতার লোককে জানিয়ে দিল যে সুমতি বেরিয়ে গেছে এবং ওর বাবা তার খোঁজ না করে আন্দামানে নাম দিয়ে চলে যাচ্ছে—বুঝতে কী আর বাকী আছে কারো! ব্যাটা চামার মেয়েটাকে বেচে—ভেবেছিল ডুবেডুবে জল খাব শিবের বাপের সাধ্য কী টের পায়। এখন ত পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মেয়ে চলে যাবার পর, পরপর দুতিন দিন ইলিশমাছ এনেছিল কোন পয়সায়। দীনবন্ধু দাশকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়—বুদ্ধি ওরও আছে কিছু! ঘরদরজা বাগবাগিচা পাকিস্তানে ফেলে আসতে পারে তা বলে বুদ্ধিটা ত ফেলে আসে নি।

অ-দ্দা তামুক খাতিচেন?

বেজেন মালো এসে বসল দীনবন্ধুর পাশে।

বসেন। দীনবন্ধু হুঁকোটা এগিয়ে দিল। ইণ্ডিয়ায় এসে আর

কিছু হোক না হোক সাতহুঁকোর হ্যাঙ্গাম ঘুচছে! একদিন দীনবন্ধুই হেসে বলেছিল। সত্যিই সাতটা হুঁকো রাখার পয়সা কোথায় আবার অতিথ-পতিথ এলে শুধু কলকেটাও এগিয়ে দিতে বাধে। হুঁকোটাই দিতে হয়। মান ইজ্জত সবই গেছে, সাতজাত যখন একাকারই হয়ে গেল—হুঁকোয় করল কী!

বাঁহাতের তালু দিয়ে হুঁকোর মুখটা মুছে পরপর দুটো তিনটে টান দিয়ে একটা লম্বা সুখটান দিল বেজেন। হুঁকোটা দীনবন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ধীরে সুস্থে ছাড়ল। বলল, আপনার ব্যাপারটা কী কতিলেন যেন? বাবুরা নিতি রাজী হল না? বালো করে ধরা করেন—আছিলাম একস্তরে—

হয়! বললে, বুড়ো আন্দারমানের জমি ওঠান তোমার কম্ম নয়। ওরে শ্‌শালারা—নিয়ে ছ্যাখ না একবার। বলে পাথর ভেঙ্গে হাতী খেদিয়ে উড়িষ্যের মরুভূমিতে সোনা ফলিয়ে ছিলাম। আর আজ ওনারা পেণ্টুল পরে বাবু হয়ে বলছেন আন্দামানের জমি ওঠান দীনবন্ধু দাসের কম্ম নয়। আমার তালুই মরে পুরো একশো বচ্ছর বয়েসে—হাঁপকাশীর রোগ, চোত মাসে যায় যায়। কবরেজ হেকিমে বললে সেই সনেই বুড়োর আয়ূদ্দ শেষ! হেসে উঠেছিল তালুই। কী কয়েছিল কতি পারেন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সগর্ব চাহনী বেজেন মালোর মুখটা ছুঁয়ে এল একবার। বলল, বললে, রাখ কোবরেজ তোমার নাড়ীটেপা—চাষ না উটিয়ে আমায় মাটি থে উটোতি তোমার যম ক্যান বাবা তিরনাথ এলেও পারবে না। বুড়ো মরল ফিরে ভাদ্দরে চাষ তুলে ত্যাবে! আর আজ আমায় বলে কী না বুড়ো তুমি জমি তুলতি পারবা না। ওরে জমিও মনিষ্যি চেনে। উঠবে আর বাপ বলবে।

আমি ত চলছি। সসংকোচে বলে ব্রজেন মালো।

হয়—শুনচি। তা আসেন। আমার ঝেতি না যাওয়াই হয়—পত্তর দেবেন মাঝে মাঝে। জমি ক্যামন, মনিষ্যিরা ক্যামন সব, খাদ্য-

খাদকের বন্দোব্যবস্থা কী সব লিখবেন। আমার মনে হয় মাছ আর নারকোল শুপুরী মিলব খুব—লবণের ভাগ ত ! ঐ আমাগো পাকিস্তানের নাবাল খুলনো নোয়াখালীর মতই অইব। সাগরের চর আর কী !

আমারও তাই ঠ্যাহে। এ্যাহন দেহি ভগমান ব্যাডা কপালে কী রাখছে। আচ্ছা চলি এ্যাহন।

মনের অস্থিরতা ব্রজেন মালোকে বসতে দেয় না। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন মাটির উত্তেজনায় অস্থির সে। আবার মাটি ডেকেছে—মাটি টেনেছে, সে টানকে মানিয়ে নেবে কী করে।

ব্রজেন মালো চলে যাবার পর দীনবন্ধু কুৎসিত গালাগালি দিয়ে ওঠে চাপাস্বরে। খুব ফুর্তি—আমাকে শুনিয়ে যাওয়া হল আর কী ! মালোর ছাওয়াল জন্ম গ্যাল মাছমেরে এখন চলেছেন কিরষি কাডে ! যা—তিনবার লোন খেয়ে হইনি এবার মালুম হবে—জমিও মনিষ্যি চেনে ! যার তার আর মা বসুমাতার নাড়ী ছিঁড়ে ফসল টেনে বের করতে হয় না ! ওরে, এ দীনবন্ধু দাশও চেরজনম এই শিয়ালদার বাড়ীতে থাকব না—পুনর্বাসন হেও পাব। তখন ভ্যাকা যাবে কে কত বড় চাষী ! কতায় আছে, যত আছিল নাড়াবনিয়া, সব অইল কিত্তনিয়া ! হও বাবা, দীনবন্ধু দাশের তাতে কিছু যাবে আসবে না—ঠ্যালা টের পাবে নিজেরাই ! বাপের কালে জমি দেখিস নি যা তোরা আন্দামানের জঙ্গলে, সাপের ছোবলে নয় বাঘের পেটে যাবার সময় একবার এই দীনু দাশের কথা মনে পড়বে !

বসে বসে কী বিড় বিড় করছ ? সারদা এসেছে কখন। বসে বসে বকছিল দীনবন্ধু।

বুত ঝাড়নের মন্তর কতিলাম—হে বুতটা ত আহে না এ্যাহনও ! দীনবন্ধু চঞ্চল চোখে একবার তাকাল চারদিকে। বারবার তাকাল—

শেষ পর্য্যন্ত যে গাড়ী এসে প্লাটফরমে ঢোকে তার প্রত্যেকটি দরজার মুখ তন্ন তন্ন করে খোঁজে, প্রতিটি যাত্রীর মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কানাইএর অন্বেষণ করে। এমন চলল শেষ গাড়ী অবধি।

নাও তুগ্‌গো খেয়ে নাও—আজ আর এল না। বেশী কাজ পড়ছে মনে লয়। মনের তুর্ভাবনা ও চঞ্চলতা গোপন রেখেই বলল সারদা।

হয়, কাজ পড়ছে! কামার দোকানের দেড় ট্যাহা ঠিকের কিষাণ, কাজ কত তার। আর রাগাস নে কলাম! এনট্রেস ছেকেন কেলাশ অব্দি পড়ে ব্যাটা আমার কামার দোকানের কিষাণ, দাদা-তালুইএর স্বগ্‌গের ঘণ্টা বাজছে। আশ্‌-শালার নেকাপড়া—তর কপালে শোয়রের গোল কুড়ানো পিছা জোটে না রে! একনাও ট্যাহা খরচ কইর‍্যা মরছি ছাওয়াল যে অ্যামন বান্দরের ছাঁ অইব জানত কেডা।

অশরিরী প্রেতাত্মার মত সারারাত প্লাটফরমের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াল দীনবন্ধু। বিড়বিড় করল আপন মনে। আন্দামান যাওয়া যে তার হবে না এত জানা কথা—বাস্তুর শাপ যাবে কোথা! বাপ-তালুইয়ের ভিটে, নিব্বংশের ভিটির মত আঁধার পড়ে থাহে! মা বসুমাতার চোখ্যের জল—হে বড় কম কথা নয়! হে মিঞার পো দেখাশোনা সবই করছে, নষ্ট হয়ত কিছুই হয় নি তবু হিঁতুর বাড়ীর আচার যখন নেই, সে ত গো-ভাগাড়ের সামিল।

ছেলেটার হলই বা কী? সেই একবার মাত্র তিনদিন বাড়া আসে নি, দিল্লী চলে গেছল। হাসি পায় দীনবন্ধুর—ওতে সারদা ভুলতে পারে দীনবন্ধু ভোলে না। তুই যে ব্যাটা জেল খেটেছিস তা আমার কাছে লুকাবি কী করে! তুনিয়াটা তুই আমার দৌলতেই দেখলি আর আমার চোখ্যে ধুলো দিবি! সারদাকে ইচ্ছে করেই বলে নি দীনবন্ধু—লাভ কী বলে! আবার এক পত্তন নাকেকান্না—আর সহ্যি হয় না!

ভাবনার কথা। ভাবেও দীনবন্ধু! যত ভাবে ততই দেখে কানাইএর বাড়ী না আসার কোনরকম সন্তোষজনক যুক্তি নিজের কাছেই খাড়া করতে পারছে না সে। শহরের পথঘাট, বিপদ কী একটা—বুকের মধ্যে ব্যথা লাগে দীনবন্ধুর। কুলিদের হাতে ঠ্যাঙ্গানি খাবার পর থেকে এই উপদ্রব—জোরে নিঃশ্বাস নিতে গেলেই খচ্ করে কোথায় বাধে যেন। মাতারীরা কয় না প্যাটের শত্তুর বড় শত্তুর। লাখ কথার কথা! মরণের লাখান বন্ধু নাই, ছাওয়ালের লাখান শত্তুর নাই! হে ব্যাটা হয়ত আরাম করে ঘুমুচ্ছে—মর্ শালা তুই দাশের ব্যাটা দাশ শ্যালদার বাড়ীতে চৌকিদারী পাহারা দিয়ে মর! আরে ছোঃ! বাপ হওন আর চোর হওন একই কথা।

রাগ হয় সারদার ওপরও। কেমন নিচ্চিন্দির ঘুম ছ্যাহ না! তুশ্‌শালার সংসার—সেই গান আছে না, ভেবে ছ্যাখ মন কেউ কারো নয়—রিলিফের গান। খিচুড়ীর ওখেনে কলে গায় গানডা। গানের কতা কী আর মিথ্যে হতি পারে! দীনবন্ধু ভাবতে পারে সারদা ঘুমুচ্ছে কিন্তু সে রাত সারদার কাটল দীনবন্ধুকে সতর্ক পাহারা দিয়ে। মানুষটা পাগল হয়ে যাবে না ত। দোহাই বাবা সাবের পীর সাহেব—চেনি দেব ঠাউর। দুভ্‌ভাবনা থেহে বাঁচাও বাবা, বুড়োডারে বাঁচাও, মাথা থোয়ার যা হয় বন্দোব্যবস্থা একটা করে দাও।

কানাই ফিরল পরদিন দুপুরে। দুচোখ লাল। মাথা রুক্ষ, কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি। দুশ্চিন্তায় সুগম্ভীর।

দীনবন্ধু কোথায় গেছে। কারা রুটি দিতে এসেছে তাই আনতে গেছে হয়ত। এটু জল দাওত মা খাব। রমলা কই? জিগ্যেস করে কানাই।

গেছে কোথায়—জল দেয় সারদা। কানাই জল খেয়ে কাচের গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয়। ওর হাত থেকে গ্লাসটা নেয় সারদা।

আরো দিমু ?

হ্যাঁ।

জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখে কানাই।

এক এক সময় যে কী চিন্তায় ফেলস তুই কানাই। আছিলি কই? সারাডা রাত তর বাপে পেলাটফরমের এমুড়ো সেমুড়ো পাগলের লাখান ঘুরছে! কনে গ্যাল এ্যাহন—রাতে খায় নাই, দুগ্‌গা শুধুমুধু পান্তা খেয়ে এই যেন গেল কই। আমার আর বালো লাগে না কিচ্ছুডি—তরা তা বুজস কই!

ভাবনার আছে কী, আমি কী ছেলে মানুষ? একটু থেমে বোধ হয় কী ভেবে নিল কানাই। বলল, যাব আর কোথায়, যে বুড়োর কাজ করতাম সে মরে গেছে কাল দুপুরে। পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে আর আসতে পারি নি। একটু থেমে, তাছাড়া তার মেয়েটাও একলা, কেউ কোথাও নেই যে দেখে। সেদিকটা সামলে আসতে—

কী কলি? বুড়ো মরছে? অইছিল কী? মেয়েডারে এ্যাহন দেখব কে? তারে একলা, নিঝক্যি একলা ফেলে এলি—স্যায়না ছেমড়ী কস্ তুই-ই। বুজি না ত গো হালচাল তারে কে ছ্যাহে কী করে ক তো!

বোঝে না কানাই ও। দুহাতে মাথা চেপে বসে থাকে। কোন রকমে ভুলিয়ে রেখে এসেছে বাদলীকে—অনেক কষ্টে।

আড় চোখে মাঝে মাঝে ছেলের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকায় সারদা। কাজটা গেল—যাই হোক, কত কষ্টে জোগাড় করা কাজ, দুশ্চিন্তা হবার কথাই। তবে ভবষ্য এই যে কাজ ত ছাড়তেই হত—ভগবানই ছাড়িয়েছে। ভালই হল!

ভাবনা চিন্তায় আর অইব কী—যা ভগমান কপালে নিবচে অয় অইবই। হাতটা ধুয়ে বয় ভাত দি। ভাত বাড়তে থাকে সারদা।

কানাই হাত পা ধুয়ে এসে ভাতের সুমুখে বসেই ওঠে। খায় না প্রায় কিছুই খিদে মরে গেছে। কাল থেকে ক'কাপ চা খেয়ে

আছে কেবল। মাকে আড়াল করে বসে একটা বিড়ি ধরায়। দুচোখ জুড়ে আসছে ঘুমে। কিন্তু ঘুমুলে চলবে না—যেতে হবে এখনই। একলা বাড়ীতে, তায় কাল সবে মরেছে বুড়ো ভয় ও করে বই কা। অথচ রাতে ওর কাছে রাখবার মত কাকেও পেল না কানাই—চেষ্টা কম করে নি। তেলেগু বৌটার নাইট ডিউটিও বুঝে বুঝে এই সপ্তায়ই পড়ল!

সতীশ বেঁচে ছিল—ভাবনা ছিল না কানাই এর। দিন শেষে দেড়টা টাকা পকেটে ফেলে বিড়ি ধরিয়ে পথে নামত। এখন? এখন নিজের ভাবনা বাদলীর ভাবনা, পেট ত তারও আছে। কাজ দোকানে হয় কিন্তু পুরাণো খদ্দের সব আসত সতীশের টানে। এখন যদি এ দোকান তারা ছেড়ে দেয় দোষ দেওয়া যায় না। রোজ রাত পোহালে অন্ততঃ দুটো তিনটে টাকার দরকার সব মিলিয়ে। চানকের ঘাট থেকে বুড়োকে পুড়িয়ে গঙ্গা স্নান সেরে উঠে ক্রন্দন-মুখী বাদলীকে দেখে প্রথমে তার এই হিসাবটাই মনে এসেছে। সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে বাদলীকে কেমন যেন শূন্যগর্ভ ঠেকেছে নিজের কানেই। তবু মনে মনে বাদলীর ভার নিজের ঘাড়েই তুলে নিতে হয়েছে কতকটা পুরুষসুলভ কর্তব্যবোধের বশে কতকটা পারি-বারিক স্বার্থের খাতিরে। স্বার্থটা দিনান্তিক, রোজ গণ্ডা।

বাড়ী ফিরে কিছুক্ষণের জন্য বাদলীর চোখে জল ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ শুকনো চোখে চারিদিকে তাকিয়ে ব্যাকুলস্বরে যখন কানাইকেই প্রশ্ন করল, এ কী হল—বাবা আমার একী করল মিস্তিরী? চোখ তার নিজেরই জলে ভরে এসেছিল। কোন রকমে সামলে নিয়ে বলেছিল, বাবা কারো চিরদিন থাকে না—ভেবে আর করবে কী বল।

কারো থাকে না বলে আমারও থাকবে না—সবার সঙ্গে আমার তুলনা—কেঁদে ফেলেছিল বাদলী। হয়ত মৃত পিতার প্রতি অভিমানেই।

এ অভিমান ভাঙ্গবার চেষ্টাও করে নি কানাই। ওর সুমুখে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে তার। কতটুকু তার শক্তি, কী সে করতে পারে। ভেবে পায় নি। তবু মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে দূর আকাশ থেকে ডানা মুড়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের।

দীনবন্ধু ফিরল খানিক পরে। কানাইকে দেখে খুব খুশী।

চ, একবার অপিসে যাওয়ার লাগব রে কানাই। প্রথম আলাপ দীনবন্ধুর। ব্যস্ত সে। কানাই এর সপ্রশ্ন চোখের দিকে না তাকিয়েই বলল, সব ব্যবস্থা পাকা কইরা থুইছি—বাবুরা তরে দেইখ্যাই নাম তুইল্যা দিব। বড় ভদ্দর লোক ওনারা দুজনেই।

অফিসে কেন? জিজ্ঞাসা করে কানাই।

আন্দারমান—আন্দারমানের ডাক আইছে কতিলাম না, নাম দিয়া থুইচি, চাষীর পোলা, ক্ষেত জমি যেহানে পাব সেহানেই যাব—হে তর আন্দারমানই বা কী আর জাহান্নামই বা কী! ভাগ্যি মাইগ্রেশনডা আগেই কিন্যা থুয়িলাম।

কানাইয়ের মাথার মধ্যে সমস্ত ঘুলিয়ে যায়। মার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাতে মাও মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কী রে ব্যাডা—কানে শুনস্ না সন্ধ হয়। দীনবন্ধু রেগে যায় এবার।

যে বুড়োর কাজ করতাম সে কাল রাতে মারা গেছে। কোন রকমে বলল কানাই। অনেক কথাই ঐ টুকুতে বলতে চাইল সে। পুনর্বাসনের ডাক একবার হাতছাড়া হওয়ার অর্থ জানে বলেই কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়।

বাপোই আইচে—এ্যাহন তয় আর এণ্ডিয়ার বাড়ীর কিচুই

ছাইড়া যাওয়ার লাগব না, শেষ বাঁধনও ভগমান ব্যাডায় কাটছে ঠ্যাহে যেন। আশ্বস্ত হয় দীনবন্ধু। আরো বলে, নে বিলম্ব করস্ ক্যান—সব ব্যবস্তাই কইর‍্যা সারছি এ্যাহন তুই গে দাঁড়ালেই কামডা পাকা কইরা সাইরা থুই। কাল আসস্ নাই কী চিন্তাই যে অতিল।

আমি এখন আন্দামান যাব কী করে—আমি গেলে দোকানটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। সে কী করে হয়। কানাই যেন সুতীব্র প্রতিবাদই করল। এদিকে শানের উপর দীনবন্ধু ততক্ষণে বসে পড়েছে। মাথাটাও ঘুরে উঠেছিল তার কানাইয়ের কথা শুনে। কয়েক সেকেণ্ড রাগের চোটে কথাই বলতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত সরোষে চিৎকার করে, তর বাপের দোকান—বন্দ অইব তায় তর কী রে হারামজাদা! মনে ঠিক দিছস কী—এক চোপাড়ে মুখ ভাইঙ্গা থুম তা জানস!

উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না কানাইয়ের। উঠে পড়ে। লাফিয়ে দাঁড়ায় দীনবন্ধু, এই হারামজাদা যাস্ কই, দাঁড়া কলাম!

লোক জমে গেছে চারিদিকে। লজ্জায় মাথা কাটা যেতে থাকে কানাই এর। ভীড়ের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে আরো ভীড়ে মিশে যায় কানাই। যদি এমন কোন যায়গা থাকত যেখানে গেলে সব দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়!

দীনবন্ধুর তর্জন গর্জনে ইতিমধ্যে তাকে ঘিরে বিরাট এক ভীড়ের সৃষ্টি হয়েছে। কৌতূহল সবার চোখে, নতুন কিছু দেখা, নতুন কিছু শোনার কৌতূহল।

ছেঁড়া বিছানার স্তূপের উপর বসে ভাবছিল সারদা। ভাবনায় কোন সুরাহা নেই। পায়ের তলার মাটি যেন আরো গভীরে চলে

যাচ্ছে—কোনদিন যে থই পাওয়া যাবে ভরষা নেই আর। দোষ বরাতের! মাটি পাগল মানুষ, জাত চাষী দীনবন্ধু, পুনর্বাসন একটা হাতছাড়া হওয়ায় তার পক্ষে ক্ষেপে যাওয়া স্বাভাবিক আবার এদিকে কানাই, ওকেই বা দোষ দেয় কী করে। মা সে। মেয়ে মানুষ সেও, মাথার ওপর স্বামী রয়েছে, কোল জোড়া জোয়ান ছেলে তবু তার হাত দুখানা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যায় সময় সময় আর সে মেয়ের শেষ অবলম্বন বুড়ো বাপটাও গেল মরে। তাকে একলা কোথায় ছেড়ে যাবে কানাই। না কী যাওয়াটা মানুষের কাজ হবে। সারদাই বা যেতে বলবে কী করে!

সারদা যেটুকু পারে তা করেছে। কানাইকে বাদলীর কাছে পাঠাবার সময় বলে দিয়েছে, বুড়োরে যে ভাবে পারি সামাল দেবোয়ানে, অর কতায় রাগ করস না, মাথার ঠিকবিঠিক নাই অর। কাল বিহানে লিচ্চয় আবি কলাম—

মার কাছে আশ্বাস পেয়ে মনটা হালকা হয়ে গেছে কানাইএর। যাক এদিককার দুর্ভাবনাটা কাটলই বলা যায়। মার অমতে তার বাবা চিৎকার ছাড়া আর কিছুই যে করবে না এ বিশ্বাস তার আছে।

সেদিনও রাতজাগা।

সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে বাদলী এসে ওর কাছে কারখানা ঘরেই বসল। খাওয়া দাওয়া করল ওরা সেখানে বসেই। পুরী। দোকান থেকে সন্ধ্যাবেলা নিয়ে এসেছিল কানাই।

বাদলী গল্প করছিল বসে বসে। গল্প না বলে সরব চিন্তাই বলা ভাল—চিন্তাও নয় স্মৃতিমন্থন। তার বাবার গল্প। কত খুটিনাটি মনে আসছিল তার, যে সব এতদিন হয়ত একবারও মনে হয় নি। কত ভাল ছিল তার বাবা!

রাত বাড়ল, যথারীতি ঘুম এল কানাইএর। কিন্তু বাদলীকে

থামতে বলবে কী বলে ? ও আজ বাবার গল্প শুনিয়ে আর স্মরণ করে পিতৃশোক ভুলতে চাইছে, তাকে বাধা দেবে কী করে ? তাছাড়া শোবার ঘরে ঢুকতেও হয়ত ভয় পাচ্ছে বেচারা। ওর কথা মনে হতে নিজের কথাও মনে হয় কানাইএর। সদ্য মৃতের বাড়ীতে বাস করা তারও এই প্রথম। বাদলী যদিও বা অভ্যাসমত গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়তে পারে সে কী পারবে একলা এই কারখানা ঘরে একা রাত কাটাতে। ভেবে দেখে, অসম্ভব। যে মানুষটা পরশুও এই ঘরে বসেছিল, কমাস ধরে এঘরে যার নিত্য উপস্থিতি, অন্যমনস্ক হলেই মনে হয় সে বুঝি ঐখানটায় বসে আছে পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে ঘোলা চোখদুটো চেয়ে। তার চেয়ে এই ভাল, বসে বসে রাত কাটান।

সন্ধ্যার দিকে গাটা ছমছম করেছিল থেকে থেকে। অভ্যাসের প্রত্যাশা—এই বুঝি সতীশ গলা খাঁকার দিল, কাশল, নয়ত ডেকে উঠল বাদলীকে। টিমটিমে ল্যাম্পের আলোয় তখন সবে বাদলী একটা দুটো টুকরো ঘটনার কথা বলছে খানিক পর পর। রাত যত গভীর হতে লাগল বাদলী যেন রূপকথার গল্প বলে যেতে লাগল, নিরবসর, অনর্গল। একের পর আরেক বিড়ি পোড়াতে লাগল কানাই, শুনতে শুনতে সে যেন বাদলার কাহিনীরই একজন হয়ে উঠল কখন। ঘুম নেই আর চোখে; মনে হয় ওর গল্প শুনতে শুনতে ও যেন কত যুগ যুগান্তর পার হয়ে এল—চলল।

ভোর হতে আর দেরী নেই খুব। হাপর জ্বালিয়েই চা করল বাদলী।

কানাই পৌনে পাঁচটার গাড়ী ধরবে।

সারদা সারারাতের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল কানাইয়ের কাছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনাত্মীয় মেয়েটার অসহায় দুর্ভাগ্যে। তারপর মনে হল কানাইএর কথা। শোক ত আর চিরকাল থাকবে না—বাঁধনও নেই কোন। রাতের পর রাত এরপর কানাইএর সঙ্গে যদি কাটায় মেয়েটা তবে এরা যৌবনকে ঠেকাবে কী দিয়ে? যা ঘটবার তা ঘটবেই। হোক তার পেটের ছেলে তবু সারদাও পারবে না কানাইকে নিরস্ত করতে। আরেক দুর্ভাবনা। ও মনিষ্যি ত পুনর্বাসন পুনর্বাসন করে হন্যে হয়ে ঘুরছে এদিকে ঘরসংসার যে তছনছ হতে বসেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। যত জ্বালাই যেন সারদার—ছেলে যেন কেবল একলা তারই!

অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না সারদা। সেদিন গেল—বিকালে কানাই চলে গেল, বলে গেল পরদিন সন্ধ্যায় আসবে। কাজ সুরু করবে কাল থেকে। সন্ধ্যায় এসে পরের গাড়ীতেই ফিরবে। রাত পাহারা! সারদা ভগবানকেই গালাগাল দেয়। ধন্যি ভগমান—ঝঞ্ঝাট কখনো একটা পাঠিও না! মানুষকে দম বন্ধ করে তিলে তিলে না মেরে ঝুপ করে তার চেয়ে আকাশটাই ভেঙ্গে ঘাড়ে ফেলে দাও না—এককথায় চুকেবুকে যাক সব ঝক্যি!

কথাটা একসময় দীনবন্ধুর কাছে পাড়ল সারদা।

মেয়েটাকে একবার দেখে আসতে পারলে হত—আহা মা-বাপ হারা মেয়ে।

খিঁচিয়ে উঠল দীনবন্ধু, রাখ তর প্যানপ্যানানী—মা বাপ মরা—মা বাপ আর আমাগো মরে নাই! জনম যখন নিয়েছ বুঝেসুঝেই নিয়েচ—মাও থাকব না বাপও থাকব না—শালার দুনিয়ায় সময় হলি নিজেরই চলে যেতে হয় তায় অর মায় আর বাপ! অত আত্যিশো তর আমার সাজে না কলাম বৌ—তর আমার সাজে না। আজ মরি কাল ঐ তর রমলাই পতে দাঁড়াব—কোন শালায় ডাইক্যা জিগাবো না এই ছেমড়ী ভাত খাইচস্?

কিন্তু চিরকাল যা ঘটে আসছে তার ব্যতিক্রম হয় না। নিজের

মত প্রতিষ্ঠিত করতে সারদাও যুক্তির জাল ছড়ায়। আত্যিশোর কথা নয়, মমত্বের কথা, মনুষ্যত্বের কথা—টাকা নয়, পয়সা নয়, তুটো মুখের কথা—পেটের মেয়ের মত সে। ধরতে গেলে তারই দৌলতে কানাইটা তুটো পয়সা যাহোক আনছে ত। তারপর ভেবেচিন্তেই বলে সারদা যে এ্যাদ্দিন বুড়ো বাপ ছিল তবু মাথার ওপর—ভরা বয়েসের মেয়েই মালিক দোকানের। কানাই এখন আর কচিখোকাটি নয় দেখেশুনে আসা দরকার মেয়েটার স্বভাব চরিত্তির কেমন। তেমন তেমন বুঝলে কানাইকে ওকাজ ছাড়াতে হবে। পুরুষ মানুষ এক ভাবে না একভাবে পয়সা উপায় করবে ঠিকই কিন্তু খানাখন্দয় পা পড়লে সামলান শক্ত। হাওড় বাঁচিয়ে নাও নিতে না পারলে জানমাল সবই পয়মাল হবে।

দীনবন্ধু বরাবরই সারদার কথায় যুক্তি আছে বলেই মানে। নয়ত মাতারী গো কতায় চলা আর বুতি পাওয়া অ এক কতা! বলে বেড়ায় পাঁচজনকে।

অয়, যাওনের মন লইচে যাও—শ্যাসম্যাস কবা ঐ ব্যাডা দাশের পোলাই আমার যাওনের বাদ সাধছে। হে আমি কতি দোব না। তয় এ্যাও কলাম কানা:য়ের মা এসব আমি বালো বুজচি না—এসব বালো নয়। কতায় বলে গীরৃত আর তর ঐ আগুন—একত্তর থুইচো কী মরচো! এগুনে হেই মরণের বার্তাডা ভাইব্যা থোবা। এট্টা ছোট্ করে কতা কয়ে দিলাম। হকা লাগব এ্যাহন, বুঝবা পরে।

গৃহস্বামীর গাম্ভীর্য দীনবন্ধুর কথার প্রতিটি বর্ণে।

চাপ চাপ কালো মেঘ আকাশে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি সুরু হয়েছে বিকাল থেকেই। বাইরের যত ধোঁয়া এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকছে। ঘরের বাতাস ভারী। ল্যাম্পের শিখা জ্বরো

রুগীর মত তৃষ্ণায় ঠোঁঠ চাটছে, ছটফট করছে। কাঠ কয়লার স্তূপের মধ্যে থেকে থেকে একটা কুনো ব্যাং ডাকছে কটকট করে। বহুদূর থেকে মেঘের গর্জন গড়াতে গড়াতে কোনরকমে এই কামারশালটুকুর মধ্যে ঢুকে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

নেভা বিড়িটা হাপরের সংরক্ষিত আগুন থেকে ধরিয়ে নিয়ে আগুনের ওপর আবার ছাই কয়লা টেনে দিল কানাই।

সারাদিনে খদ্দের আসেনি একটাও। মাগীকলের কামিন একজন এসেছিল পুরণো বঁটিতে পান দিতে। সতীশ মরে গেছে শুনে ভেগেছে। কুটনো কোটার বঁটি, দু'একখানাই কেনা যায় জীবনে। সেখানা আনাড়ীর হাতে দিয়ে নষ্ট করার মূর্খতা নেই তার।

ঘর সংসার পেতে বসেছে রমলাও। রাজ্যির মালা, ভাঙ্গা সরা, ঘট সংগ্রহ করে ঐ কামারশালের কোনেই নিজের ঘর-সংসার পেতে নিয়েছে। মার সঙ্গে আসে সেও। সারাদিন থেকে যায় কোন কোনদিন। গান গায় আর খেলা করে—শ্বাশুড়ী পুড়িয়ে যাবার উল্লাস নেই যদিও এ গানে। সারদা বৃষ্টি মাথায় করেই বিকালে পৌঁছেছে এসে। দীনবন্ধু কানাই দুজনের জন্যেই রেঁধে বেড়ে রেখে আসে। কানাই গিয়ে বেড়েগুড়ে নেয়।

চায়ের গেলাসটা ওর সুমুখে নামিয়ে দিল বাদলী। কানাই ওর দিকে তাকিয়েই চোখদুটো নামিয়ে নিল। বিরসকণ্ঠে বলল শুধু, চা এনেছ—দাও।

বাদলী ওর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল বার কয়েক। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। প্রকাশ করতে না পারার ব্যথায় আরও করুণ হয়ে উঠল তার চাহনী। ব্যথায় করুণ, সমবেদনায় করুণ—করুণ আপন অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কারে। মূক অভিযোগ মৃত পিতার বিরুদ্ধে তারই স্মৃতির কাছে—কেন এমন পরের গলগ্রহ করে ফেলে গেলে!

ওর মুখে চোখ পড়তেই কানাইএর দৃষ্টি সতর্কতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সন্ধানী দৃষ্টি আলতো ছুঁয়ে আসে বাদলীর ছলছলে চোখদুটো। আবার নতুন কী মেঘ ঘনাল বুঝতে পারে না কানাই। বুঝতে পারে না বাদলীর মনের আকাশে কোন পুরবীয়ার ছোঁয়া লেগেছে।

কিছু বলবে? জিগ্যেস করল কানাই।

আজ আর ফেরে না—বৃষ্টি বোধ হয় চেপেই আসবে, থেকে যাও। আসল কথাকে চাপা দিল বাদলী। চাপা দিল মনটাকে বিকেন্দ্রিত করে।

বাবা ভাববে—তাছাড়া—বাদলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস খুঁজল কানাই।

ভাল্লাগে না বাপু—আর দগ্ধে মের না, যা বলবার বলে ফেল। কাতরোক্তি করে যেন বাদলী। হয়ত কেঁদে ফেলবে এখনি। এসময় যদি কানাইও অমন ঢাকঢাক-গুড়গুড় করে তবে দমবন্ধ হতে আর দেরী থাকবে কা তার!

ম্লান হেসে কানাই বলেই ফেলল, এট্টা চাকরী বাকরীর সন্ধান আর না করলেই নয় বাদলী। সাতদিন ধরে ঠায় বসে—মোটমাট দুটো কী আড়াইটে টাকা রোজগার, মাথা খাবাপ হবার জোগাড়।

স্তম্ভিত হয় বাদলী। কাজ হচ্ছে না জানে সে-ও। না জানার কথা নয়। কামারশালের কাজ হচ্ছে কী না হচ্ছে জনান দেবে নী-হাতুড়ীই—মুখ ফুটে বলতে হয় ন কাবো। কিন্তু কানাইএর কাজ খোঁজার কথাটা এতই আকস্মিক এবং বহুমুখীন ইঙ্গিতপূর্ণ যে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় সে। সামলাতে পারেনা নিজেকে। একটুকরো তক্তার উপর বসে পড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আরো কিছু শোনবার প্রত্যাশায়—যা শুনে অন্ততঃ দুস্তর সমুদ্রে কিছুক্ষণ ভেসে থাকবার আশ্বাস পাবে সে।

কাজ নেই দোকানে, সুতরাং কানাই তার রোজগণ্ডাও পাচ্ছে না এবং রোজগণ্ডা না পেলে তার দিন চলে না—এ পর্যন্ত অনেকদিন থেকেই সুস্পষ্ট ছিল বাদলীর কাছে। এখন আবার ঐ রোজগণ্ডার

পারম্পর্য তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। কানাই কাজ ছেড়ে নতুন কাজ খুঁজবে। কাজ কোথায় পাবে সে কে জানে। যেখানেই পাক আর নাই পাক বাদলীর থাকতে হবে নিঃস্বহায় নিরবলম্ব হয়ে। একলা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওর দিকে তাকাবার থাকবে না কেউ। কেউ ভাববে না ও খাবে কী, ভাববে না ওকে খাওয়াবে কে !

বাবার হাতে গড়া দোকান থেকে একটি একটি করে জিনিষ বেচতে হবে পেটের জন্য—তাতে আর কদিন চলবে৷ তারপর কী হবে তার—মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায় বাদলীর। বিরাট বিশ্বে তার পায়ের তলার মাটিটুকু ধরেই যেন নাড়া দিল কানাই—এখনই টেনে নেবে জন্মের মত। তলিয়ে যাবে বাদলী, মিলিযে যাবে অগণিত মানুষের ভীড়ে প্রেতাত্মার মত। প্রেতাত্মার মতই হয়ত ঘুরে বেড়াতে হবে কল বাজারের পথে পথে—বাঁচবার আর কোন পথই খোলা নেই। অথচ এ মৃত্যুর ভয়ংকরত্ব উপলব্ধি করবার মত শাস্ত নয় তার মন এখন।

কী, কথা বলছ না যে। কানাই বলল।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বাদলীর তবু বলল, কী বলব।

কিছুই কী বলবার নেই—এ অবস্থায় তুমিও যদি শোকে অত কাতর হয়ে থাক আমি একলা কী করি বল ত, একলা ভেবে যে কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। কানাইএর আবেদনও সাড়া জাগায় না বাদলীর মনে।

আমি কা বা বুঝি, আমার মধ্যে যে বুদ্ধিটুকু ছিল তা বাবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে। আজ আমি কত অসহায়—উঃ—আমার কী হবে !

এতক্ষণে কাঁদতে পারে বাদলী। হয়ত কানাইএর কথার অন্তর্নিহিত সহৃদয়তা ও বাদলীর বুদ্ধিতে নির্ভরশীলতার সুক্ষ্ম অনুরণন বাদলীর বুকের ঢিলা তারটাকে টানটান করে দেয়, তারবাঁধার ঝংকার বুঝি ছড়িয়ে পড়ে ওর বিরস পাণ্ডুর সুপুষ্ট ওষ্ঠদ্বয়ে !

বিব্রত হয় কানাই। মেয়েমানষের কান্না—মনে মনেই বলে কানাই—ও চুলোর ছাই সব ভণ্ডুল করে ছাড়ে। ভাবনায় পেটের ভাত চাল হচ্ছে—আচ্ছা ঝকমারী করেছে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে। আবার করুণাও বোধ করে বাদলীর ওপর—আহা এত বড় শোকটা সামলাতে পারছে না। সবে মাত্র তের দিন!

পুরুত এসেছিল? কথাটা ঘুরোতে চেষ্টা করে কানাই।

হাঁ। টাকা তিরিশেকের ফর্দ দিয়ে গেছে। টাকা আছে আমার কাছে। নিজের শেষ কাজের ব্যবস্থাটা পযন্ত করে রেখে গেছে বাবা আমার—ডুকরে কেঁদে ওঠে বাদলী।

কী হল মা আবার সাঁঝবেলায় কান্নাকাটি কার লাইগ্যা। কানতে নাই মা কানতে নাই—বাপ মা কী আর চেরদিন থাহে? আমার গ্যাহ ত—বাপ মা বাই সব থাইক্যাও নাই, পাকিস্তানে ছাইর‍্যা আইচি, এ জনমেব মত্তি দেখনের কাম সাইর‍্যাই থুইছি কতি পার। যমে যারে নিল তার লাইগ্যা শোক করনে কোন কামডা আগাইব কতি পার! চক্ষ্যুতে জল—সাঁঝেবেলায় ফেলতি নাই, অকল্যেণ লাগে! সারদা এসেছে ওর কান্না শুনে। রমলা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে তখন নাক খুটছে আর ভাবছে, আচ্ছা কোথায় গেল বাদলাদির বাপটা—ওঃ বাপটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল না, হ্যাঁ তার নিজের বাপের থেকেও খারাপ নিশ্চয়ই। কারণ রমলার বাপ শুধু মাকে কাঁদাবার জন্যই যেখানে খুশী চলে যাব বলে—মরে চলে যাব বলে না। মরে জায়গাটা কেমন? মরেতে গেলে বুঝি কেউ তার সঙ্গে যায় না। বাদলাদির বাপটা ছিল বেজায় বদ—গেলি গোল বাদলাদিকে নিয়ে যেতে কি হয়েছিল। দাদাই ত বলে রিফ্যুজিদের রেলে ভাড়া লাগে না। তাছাড়া টিকিটবাবুরা ত সবাই রমলার চেনা।

বাদলী বলল, অকল্যেণ—আর কী অকল্যেণ হবে মাসীমা! বাবা আমায় বড্ড ভালবাসত তাই কী শেষকালে পথে বসিয়ে গেল?

তবু ত এ্যাহনো ঘরেই রতিচ বাছা—বিটিগো ওকতা কওন লাগে না, বুইলা। কওন ক্যান, মনস্ত করাই পাপ। সারদা ধমকই দিল যেন।

সারদার কথা সব বুঝতে পারে না বাদলী। পূর্ববঙ্গের বরিশালের কোন সুদূর গাঁয়ের মেয়ে, বৌ—ক'বছর ধরে নানা জেলা নানা প্রদেশের মানুষের সঙ্গে আঠার মত লেগে থেকে থেকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও হারিয়েছে—কথায় পাঁচ জেলার পাঁচ রকমের প্রভাব।

সারদা ওকে খানিকটা প্রবোধ দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। রমলা নিজের কাজ ফেলে বাদলীর কাছটিতে বসল এসে। বাদলী কোলের কাছে চেপে ধরল রমলাকে—নিবিড় ভাবে চেপে ধরল। পোষা বেড়ালের মত চুপ করে স্বতোৎসারিত আবেগতপ্ত আকর্ষণটুকু উপভোগ করতে লাগল রমলা।

কাজের কথা কি আর বলছি সাধে। আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বাবা ত করেই ফেলেছিল—একটু থেমে বাদলীর চোখের ওপর চোখ রেখেই বলল কানাই—তোমার বাবা কী শুধু তোমাকেই বিপাকে ফেলেছেন, আমাদের কথাটা ভাব ত! ঘর নেই দোর নেই—পুনর্বাসনের ডাক ছেড়ে দিলাম এদিকে কাজের ত এই অবস্থা খাওয়া দূরে থাক মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও যে নেই! তুমি বুঝবে না, পুনর্বাসনের ডাক ছাড়া আর মরণের ডাক শোনা এককথা! ফাটা শিমূল তূলোর মত কোথায় যে ভেসে যাব কে জানে!

বাদলী কোন কথা বলে না। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ওর মনটা। কানাইকে সে যেন নিজের সঙ্গে কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে বোধ হয়। ব্যথা ঘনায় ওর দুচোখে।

এক কাজ করলে হয় না? কুণ্ঠিত বাদলী যেন অনুমতি চায় ওর আপন মতটা প্রকাশের। হীনমন্যতা ওকে গ্রাস করে ফেলেছে সতীশ মরার সঙ্গে সঙ্গে।

কী ? সপ্রশ্ন কানাই।

তোমরা সব্বাই এ বাড়ীতে চলে এস। আমি ঐ বাইরেটা খানিকটা পরিষ্কার করে ওখেনে সকালে বিকেলে তরি-তরকারী বেচব—বাবার খদ্দের রয়েছে কত, তাদের বললে মাল তারাই দিয়ে যাবে। আমার খরচটা তা থেকেই চলে যাবে। আর এক কা করলে মন্দ হয় না—তুমিও যখন চাকরী খুঁজতে চাচ্ছ, কাল রোববার, চল একবার এরসাদ মিস্তিরীর কাছে কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাই। কেলভিনের তাঁত ঘরের মিস্তিরী বাবার দোস্ত—ধরলে করলে কাজ একটা দিতে পারে। তবে ব্যাটা যা ঘুষখোর, টাকা ছাড়া কথা বলতেও রাজী নয়! বাদলী থামল কানায়ের মতামতের জন্য।

কানাই এর মুখের মেঘ যেন কেটে যেতে থাকে। একখণ্ড আশার আলোয় তার চোখদুটো চকচক করে। ঘুষ—কত আর ঘুষ নেবে। দোব না হয় প্রথম মাসের টাকাটা। বাদলীর ওপর, বাদলীর বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধান্বিত হয় সে। কিন্তু যে বাদলী নিজের ঘরকন্নাটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না সে কী পারবে তরকারীর দোকান করতে। আর তা সে করবেই বা কেন? বাদলী যদি দোকানদারী করে খাবে তবে কানাই ত আন্দামানেই যেতে পারত। ওদের চারজনের একবেলা জুটলে, বাদলীরও জুটবে।

কেন যেন বাদলীকে এখন আর মনিব মনে হয় না কানাই এর। মনে হয় সে যেন কচি লাউএর ডগা একটা, ওকে অবলম্বন করেই উঠেছে ওপর দিকে মাথা তুলে। নিজের ওপর বিশ্বাস নতুন করে জন্মায় কানাই এর—অথবা নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে বোধ জাগে।

রোববারে এরসাদের কাছে কানাইকে নিয়ে যায় বাদলী। ঝকঝকে রোদ উঠেছে ভোরেই।

এরসাদ বসে বসে মেদীরঞ্জিত দাড়িতে হাত বোলায়। গোঁফ দাড়ীর জঙ্গলের ফাঁক থেকে একটু হাসেও বুঝি বা। তিরিশ বছর কলবাজারে আছে সে। ভুলে গেছে কবে মজঃফরপুর থেকে এসে হাওড়া ষ্টেশনে নেমেছিল। দু' আনা সুদে টাকা খাটায়—লোককে চাকরী করে দেয় ঘুষ নিয়ে। দরকার হলে দুচারটে মাথা—তা এরসাদের হুকুম বরদাররা যখন তখন নিয়ে আসতে পারে তাকে খুশী করতে।

ক্যা বেটি—বৈঠ্ যা। ওকে খাটিয়ার একপাশেই বসিয়ে নিল বুড়ো এরসাদ।

বাদলী যখন কানাইকে দেখিয়ে তার জন্যে একটা চাকরীর কথা বলল বিস্মিত হল এরসাদ। জিগ্যেস করল, কামারশালে তাহলে কাজ করবে কে ?

ও আর চলবে না চাচাজী—দোকানের মালপত্তর বেচে দোব একটা খদ্দের জোগাড় করে দাও না। একটু থেমে বলল বাদলী, সেই টাকায় একটা যা হোক দোকান খুলব, হয় ভুজার দোকান নয়ত শব্জীর। নিজের পেটটা চালাতে হবে ত !

গম্ভীর হয়ে রইল এরসাদ কিছুক্ষণ। তার পর মিট মিট করে হাসতে লাগল। চোখদুটো নেচে উঠল শোঁয়াপোকার মত ভ্রূযুগলের নীচে। মেদীরাঙা দাড়ীতে বার কয়েক হাত বুলাল সে। তারপর কানায়ের দিকেই তাকিয়ে বলল, জান ত আমি নোকরী শুধু মুখে দিই না, দস্তুরী লাগে।

বাদলীই বলল কানাইএর হয়ে, সে জানি—সে ব্যবস্থা আমি করব। যত টাকা মাহিনা হবে তত টাকা আমি তোমাকে দোব পান খেতে।

চুপ রহ বেটি ! এরসাদ যেন ধমকই দিল ওকে। কানাইকে গরম ভাবেই বলল, চাকরী করবে তুমি, তুমি বল কী দেবে।

আপাততঃ দেবার মত আমার কিছুই নেই ওস্তাদ। তবে চাকরী হলে—

হো হো করে এরসাদ হেসে ওঠায় কানাইয়ের কথায় বাধা পড়ে।

হাসির ধমকটা থামিয়ে আর একবার দাড়ীতে হাত বোলায় সে। বলে চাকরী হবার পর আর আমাকে মনে থাকবে না। আগেই দিতে হবে—মানে কথা দিতে হবে বুঝলে। আর বেইমানী করলে তুনিয়ার রুটির ভাবনা আর তোমার কোনদিন ভাবতে হবে না! তোমার চাকরী আমি দিতে পারি যদি তুমি বাদলী মায়ীকে সাদী করতে রাজী হও।

চাচাজী! এরসাদের শিথিলচর্ম বিশাল পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বাদলী। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলায় এরসাদ। বলে, ক্যা বেটি, ম্যঁয় ত কুছ্ গুনাহ্ নেই কিয়া?

কানাইএর কাছে ও প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে সে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে এরসাদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। শিথিলচর্ম চোয়ালের হাড় সুদৃঢ়, উদ্যত। চোখ তুটো দপ্ দপ্ করছে যেন। মুখ নামিয়ে নিল কানাই। ভাবল এক মুহূর্ত। বলে ফেলল তারপর—বাদলী রাজী হলে আমার আপত্তি নেই ওস্তাদ!

বুড়বাক্ কাঁহাকা! এরসাদ কানাইকে সস্নেহ তিরস্কার করার ফাঁকে চাপা শ্বাসটুকু ছেড়ে দিল বুঝি। মনে মনে হাসে এরসাদ। মেয়ে মানুষের বুকের কথা বুক দিয়ে না শুনে যারা মুখ থেকে শুনতে চায় তারা এরসাদের বিচারে উজবুক ত বটেই। মনে মনেই ভাবে এরসাদ, এ বয়েসটাই এমন! ভাগ্যিস এসেছিল তুটোতে তা না হলে কী এক বাওয়াল সৃষ্টি করে তুটোতে তুদিকে ছিটকে পড়ত কে জানে!

যাও, কাল সকাল ছটায় কারখানার গেটে সামিল হয়ে যাও। রায় দিল এরসাদ। এ রায়ের নড় চড় নেই এরসাদ মরার আগে।

এরসাদ কথা বলতে থাকে কানাইএর সঙ্গে।

বাদলীর প্রয়োজন কিছুক্ষণের নিঃসঙ্গতা, নিবিড় একাকীত্বে নিবিষ্টচিত্তে সে চায় নিজের মনের কাছে শেষ খবরটা জানতে— কতটা সুখী সে! হৃদয়ে দৃঢ় মূল বিশেষ আকাংখা, প্রতি দিবসের নির্জনতায় পুষ্ট কামনাকে এত সহজে সফল হতে দেখে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। কত ভাবেই সে চেষ্টা করেছে কানাইকে বাঁধতে, কানাই এর কাছে নিজের মনটাকে মেলে ধরতে কিন্তু পারে নি, অথচ কেমন এক কথায় এরসাদ সব সমস্যার সমাধান করে দিল।

কাল সন্ধ্যায়ও বাদলীর মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব বাতাসটুকু বুঝি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। চিমণীর কয়লাপোড়া কালো ধোঁয়ায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে গেছে। আজ সকালেও কী ভাবতে পেরেছিল বাদলী, এমনটি হবে।

এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে অনেক আলো অনেক বাতাস। বৃষ্টি থামা আকাশটায় রৌদ্রের ঝলমলানি। সামনের বস্তীর খোলার চালে বসে কটা চড়ুই কিচির মিচির করছে।

এরসাদকে মনে হয় কত আপনার। সেই ছেলেবেলায় যে এরসাদের কোলে চড়ে বেড়াত আবার সেই এরসাদকে যেন ফিরে পায় বাদলী। ফিরে পায় সতীশের পরিপূরকরূপে। দুনিয়ায় তাহলে নিঃসহায় নয় সে, নির্বান্ধব নয়।

আনন্দে বুঝি কেঁদে ফেলবে এখনি।

বাদলী বলল, এবার চলি চাচাজী, বাসায় কেউ নেই।

থোড়া মিঠাই ত খা যা বেটি। ওর কাঁধ চেপে বসিয়ে দিল এরসাদ।

কানাই চুপ করে বসে ভাবছিল। পারম্পর্যহীন সঙ্গতিশূন্য চিন্তা। সুমুখের ড্রেনটার দিকেই তাকিয়ে ছিল কানাই। বুজকুড়ী উঠছে, ঘুলিয়ে চলেছে নোংরা জলের স্রোত গঙ্গায় পড়তে। পথের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে ড্রেনটা।

কাল সকালে ছটার ভেঁপু বাজবার আগেই কানাইও চলবে ঐ পচা জলের সাথে সাথেই। পচা জল গিয়ে পড়বে গঙ্গায় আর সে মাথা গলিয়ে ঢুকে যাবে কেলভিন জুট মিলের বিরাট গেটের আড়ালে। সামিল হবে লক্ষ শ্রমিকের সারিতে, নিজেকে গেঁথে দেবে জীবনদেবতার বরমাল্যে।

নাথারকান্দির ভারাণী খালটা কিন্তু মিশছে গিয়ে ভৈরবের সঙ্গে। সেটাও এসে একদিন গঙ্গায়ই মিশবে হয়ত, হয়ত সেও আসবে কানাইএর সন্ধান পেয়ে।

তার কূলে কূলে তখন বসতবাড়ী আর ক্ষেত খামার গড়ে উঠবে কী বস্তীর ভীড় জমবে জানে না কানাই। তবে এটুকু বুঝেছে সূর্যের সঙ্গে চলবার দিন সুরু হল আজই—কাল থেকে চলতে হবে সূর্যের নির্দেশে !!

=প্রথম খণ্ড=

॥ শেষ ।